দাম : ষোলো টাকা

মোমিনপুরে জেহাদি হিংসা ধামাচাপা দেওয়ার চেষ্টা তৃণমূলের— পৃঃ ১৩

স্বস্তিকা

মোদীনোমিক্সের জাদুতে দৌড়চ্ছে ভারতের অর্থনীতি— পৃঃ ১৫

৭৫ বর্ষ, ১০ সংখ্যা।। ৭ নভেম্বর, ২০২২।। ২০ কার্তিক - ১৪২৯।। যুগাব্দ - ৫১২৪।। website : www.eswastika.com

মোদীকে হটাতে সক্রিয় আন্তর্জাতিক দুনিয়া

CENTURYPLY®
CENTURYPLY®
CENTURYLAMINATES®
CENTURYVENEERS®
CENTURYPRELAM®
CENTURYMDF®
CENTURYDOORS™
zykron
FIBRE CEMENT BOARDS & PLANKS
STARKE
NEW AGE PANELS
SAINIK
PLYWOOD
HAMESHA TAIYYAR
For any queries, SMS 'PLY' to 54646 or call us on 1800-2000-440 or give a missed call on 080-1000-5555
E-mail: kolkata@centuryply.com | CenturyPlyOfficial | CenturyPlyIndia | YouTube Centuryply1986 | Visit us: www.centuryply.com

স্বস্তিকা

।। বাংলা সংবাদ সাপ্তাহিক।।

৭৫ বর্ষ ১০ সংখ্যা, ২০ কার্তিক, ১৪২৯ বঙ্গাব্দ

৭ নভেম্বর - ২০২২, যুগাব্দ - ৫১২৪,

Website : www.eswastika.com

সম্পাদক : তিলক রঞ্জন বেরা

সহ সম্পাদক : সুকেশ চন্দ্র মণ্ডল

প্রচ্ছদ ও রূপায়ণ : অজিত কুমার ভকত

দূরভাষ :

সম্পাদকীয় : ৮৪২০২৪০৫৮৪ (W)

সার্কুলেশন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৫

সার্কুলেশন হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪

বিজ্ঞাপন : ৯৩৩০৩৭৭৯২৩

দাম : ১৬ টাকা

বার্ষিক গ্রাহক মূল্য ৭০০ টাকা।

Postal Registration No.- KOL RMS/048/2022-2024

R N I No. 5257/1957

দূরভাষ : ২২৪১-০৬০৩ / ৫৯১৫

E-mail : swastika5915@gmail.com

vijoy.adya@gmail.com

Website : www.eswastika.com

শুভস্বস্তিকা প্রিন্টস ফাউন্ডেশন -এর পক্ষে প্রকাশক এবং মুদ্রক সারদা প্রসাদ পাল কর্তৃক ২৭/১বি, বিধান সরণি, কলকাতা-৬ থেকে প্রকাশিত এবং সেবা মুদ্রণ, ৪৩, কৈলাশ বোস স্ট্রীট, কলকাতা-৬ হতে মুদ্রিত।

সূচীপত্র

সম্পাদকীয় □ ৫

মমতা আগুনে আগুন দিয়েছেন, তাই তাঁকে ফল ভুগতে হবে □ নির্মাল্য মুখোপাধ্যায় □ ৬

শাঁখা সিঙ্গুরের দিব্যি... □ সুন্দর মৌলিক □ ৭

সেই বিশ্বস্ত ব্যক্তিই নতুন প্রধান, আর দলও সেই প্রাচীন □ অসীম আলি □ ৮

কলমধারী মাওবাদীদের নিয়ে মোদীর বার্তায় বিরোধীদের গোঁসা □ বিশ্বামিত্র □ ১০

মাননীয়া কেন বললেন, আমি তো কলা খাইনি? □ সুজিত রায় □ ১১

মোমিনপুরে জেহাদি হিংসা ধামাচাপা দেওয়ার চেষ্টা তৃণমূলের □ সুদীপনারায়ণ ঘোষ □ ১৩

মোদীনোমিক্সের জাদুতে দৌড়চ্ছে ভারতের অর্থনীতি □ সুদীপ্ত গুহ □ ১৫

মোদীকে হটাতে সক্রিয় আন্তর্জাতিক দুনিয়া □ ড. রাজলক্ষ্মী বসু □ ২৩

নরেন্দ্র মোদীর বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিক চক্রান্ত □ নিখিল চিত্রকর □ ২৬

ধর্ম বিশ্বজনীন উপলব্ধি □ নন্দলাল ভট্টাচার্য □ ৩১

ইতিহাসে ধলঘাটের যুদ্ধ হলদিঘাটের মতোই মহিমময় □ দীপক খাঁ □ ৩৪

আপাতত সৌরভকে ধরে বাঁচতে চাইছে তৃণমূল □ বিমল শঙ্কর নন্দ □ ৩৫

শাসক দলের কফিনে শেষ পেরেক, চাকরি প্রার্থীদের ওপর পুলিশের বর্বরোচিত আক্রমণ □ জাহ্নবী রায় □ ৩৭

সংস্কৃতি ও অর্থনীতির সমন্বয়ে তৈরি হয় সমবায় ব্যবস্থা □ উৎপল জালান □ ৪৩

পশ্চিমবঙ্গের সঙ্ঘকাজের অন্যতম স্তম্ভ কেশবরাও দীক্ষিত □ সত্যনারায়ণ মজুমদার □ ৪৫

নিয়মিত বিভাগ

চিঠিপত্র : ১৯-২০ □ অঙ্গনা : ২১ □ সুস্বাস্থ্য : ২২ □ সমাবেশ সমাচার : ২৮-৩০ □ অন্যরকম : ৩৮ □ পুস্তক প্রসঙ্গ : ৩৯ □ নবাঙ্কুর : ৪০-৪১ □ সংবাদ প্রতিবেদন : ৪৮-৪৯ □ চিত্রকথা : ৫০

প্রকাশিত হবে
১৪ নভেম্বর
২০২২

স্বস্তিকা

প্রকাশিত হবে
১৪ নভেম্বর
২০২২

আগামী সংখ্যার আকর্ষণ

নেহরুর ভুল ভারতের মাশুল

স্বাধীন ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরু। তাঁর শাসনকালে তিনি এমন কিছু ভুল সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন যার মাশুল এখনও আমাদের দেশকে, আমাদের দেশের মানুষকে গুনতে হচ্ছে। স্বস্তিকার আগামী সংখ্যায় থাকবে নেহরুর এরকমই কিছু ভুল নিয়ে আলোচনা। লিখবেন সুকল্প চৌধুরী, দেবযানী ভট্টাচার্য, বিশ্বপ্রিয় দাস, নিখিল চিত্রকর প্রমুখ।

দাম ষোলো টাকা মাত্র

বিজ্ঞপ্তি

স্বস্তিকার সকল গ্রাহক ও প্রচার প্রতিনিধিদের অনুরোধ করা যাচ্ছে যে, তাঁরা যেন তাঁদের দেয় টাকা নিম্নবর্ণিত ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে **NEFT**-র মাধ্যমে সরাসরি জমা দেন। যে কোনো ব্যাঙ্কের শাখা থেকে টাকা পাঠাতে পারেন।

টাকা পাঠিয়ে স্বস্তিকা দপ্তরে অবশ্যই জানাবেন।

ফোন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪,

৮৬৯৭৭৩৫২১৫,

হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪

Account Name :
SUBHSWASTIKA PRINTS FOUNDATION
A/C. No. : **103502000100693**
IFSC Code : **IOBA0001035**
Bank Name :
INDIAN OVERSEAS BANK
Branch : **Sreemani Market**
Kolkata-700 006

With Best Compliments from :-

A

Well Wisher

জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী

সম্পাদকীয়

ষড়যন্ত্র ঘরে-বাহিরে

স্বাধীনতার পর বহু দশক ধরিয়া দেশ যোগ্য নেতৃত্বের দর্শন পায় নাই। যাঁহারা ক্ষমতাসীন হইয়াছিলেন তাঁহারা নীতি পঙ্গুত্বে ভুগিতেছিলেন। দেশ সেবার চাইতে নিজেদের আখের গুছানো ও স্বজনপোষণে তাহারা সিদ্ধহস্ত হইয়া উঠিয়াছিলেন। তাহার ফলে দীর্ঘদিন দেশবাসী যেমন সর্বদিক দিয়া উন্নয়ন হইতে বঞ্চিত ছিলেন, তেমনই দেশের নিরাপত্তা ও অখণ্ডতাও বারে বারে বিঘ্নিত হইতেছিল। ফলস্বরূপ বিশ্বের দরবারে দেশের নেতৃবৃন্দ উপহাসের পাত্র হইয়া পড়িয়াছিলেন। ইতিবাচক বিদেশনীতি না থাকিবার ফলে বিশ্ব দরবারে ভারত প্রায় একঘরে হইয়া পড়িয়াছিল। তখন ভারতবর্ষের সম্মান বলিতে কিছু ছিল না। ভারতবাসী ইহাকেই তাহাদের ভবিতব্য মনে করিয়া দিনাতিপাত করিতেছিলেন। কালক্রমে সময়ের বদল ঘটিয়াছে। বর্তমানে দেশ পরিচালনায় ভারতবাসী যোগ্য নেতৃত্ব পাইয়াছে। বর্তমান নেতৃত্বের নিকট দেশই সর্বপ্রথম। দেশের একেবারে ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র ব্যক্তিটির উন্নয়নের জন্য তাঁহারা বদ্ধপরিকর। এই নেতৃত্বের সর্বপ্রধান ব্যক্তিটি হইলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। তাঁহার সরকার দেশের দরিদ্রতম মানুষটির জীবনযাত্রার মানোন্নয়নের সর্বপ্রকার ব্যবস্থা করিয়া চলিয়াছে। সেই সঙ্গে দেশের সর্বপ্রকার দুর্নীতির মূলেও কুঠারাঘাত করিয়াছে। ইহার জন্য তাহাদের বিমুদ্রীকরণের মতো কঠোর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতেও হইয়াছে। দেশের সম্পদ লুণ্ঠন করিয়া দেশবিরোধী কার্যকলাপে মদতদাতা বহু বেসরকারি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থারও রেজিস্ট্রেশন বাতিল করিতে হইয়াছে। প্রধানমন্ত্রীর তত্ত্বাবধানে দেশে সর্বব্যাপী উন্নয়নকেন্দ্রিক এবং দুর্নীতিমুক্ত প্রশাসন গড়িয়া তোলা সম্ভব হইয়াছে। তদুপরি প্রধানমন্ত্রীর সফল বিদেশনীতির ফলে সমগ্র বিশ্ব আজ ভারতকে সম্মানের দৃষ্টিতে দেখিতে শুরু করিয়াছে। বর্তমানে ভারতের প্রধান শত্রু দেশই বিশ্ব দরবারে একঘরে হইয়া পড়িয়াছে। বলা যাইতে পারে, ভারত আজ বিশ্বমঞ্চে নেতৃত্ব দান করিতেছে। আন্তর্জাতিক মঞ্চে নরেন্দ্র মোদী ভারতীয় সংস্কৃতির রাষ্ট্রদূত হিসাবে চিহ্নিত হইয়াছেন। ইহার কারণেই তিনি বিশ্বের প্রভাবশালী তোরোটি রাষ্ট্রের রাষ্ট্রপ্রধানদের মধ্যে শীর্ষতম স্থানে বিরাজ করিতেছেন। ২০১৮ সালে তিনি শান্তি ও উন্নয়নের স্বীকৃতি স্বরূপ সিওল শান্তি পুরস্কারে ভূষিত হইয়াছেন। ২০১৯ সালে তাঁহাকে গ্লোবাল গোলকিপারের সম্মানে ভূষিত করিয়াছে নিউইয়র্কের বিল অ্যান্ড মেলিন্ডা গেটস ফাউন্ডেশন। ইহা আন্তর্জাতিক লক্ষ্য পূরণের উদ্দেশে নিজের দেশ বা পৃথিবীতে প্রভাবমূলক কাজের জন্য প্রদান করা হইয়াছে। পরিবেশ সংরক্ষণের প্রয়াসের স্বীকৃতিস্বরূপ রাষ্ট্রসঙ্ঘ তাঁহাকে 'চ্যাম্পিয়ন অব দ্য আর্থ' সম্মানে ভূষিত করিয়াছে। ইহা ছাড়া, সৌদি সরকার তাহাদের সর্বোচ্চ অসামরিক সম্মান 'অর্ডার অব আব্দুল্লাজিজ আল সৌদি', রাশিয়া সরকার তাহাদের সর্বোচ্চ সম্মান 'অর্ডার অব দ্য হোলি অ্যাপস্টেল অ্যান্ড্রু দ্য ফার্স্ট', প্যালেস্টাইন তাহাদের 'গ্র্যান্ড কলার অব দ্য স্টেট অব প্যালেস্টাইন', আফগানিস্তান 'আমির আব্দুল্লা খান', সংযুক্ত আরব আমির শাহি তাহাদের 'জায়েদ মেডেল', এবং মালদ্বীপ 'রুল অব দ্য নিশান ইজুদ্দিন' সম্মানে ভূষিত করিয়াছে। এত সম্মাননা, এত স্বীকৃতি ইহার পূর্বে ভারতের কোনো রাষ্ট্রপ্রধান পান নাই।

কিন্তু ভারতবর্ষের দুর্ভাগ্য যে দেশের সুরক্ষা ও সমৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বিশ্বে সর্বশ্রেষ্ঠ জনপ্রিয় নেতা হিসাবে নরেন্দ্র মোদীর উঠে আসা মোদী বিরোধী তথা ভারতবিরোধী শক্তিগুলি মানিয়া লইতে পারিতেছে না। ইহার জন্যই তাহারা দেশকে কালিমালিপ্ত করিবার বহুমুখী ষড়যন্ত্র নিরন্তর করিয়া চলিয়াছে। ভারতের প্রধানমন্ত্রী আজ ঘরে-বাহিরে ষড়যন্ত্রের শিকার। ভারতবিরোধী আন্তর্জাতিক চক্রও সমানভাবে সক্রিয় । ২০১৯-এ তিনি যাহাতে পুনরায় প্রধানমন্ত্রী নির্বাচিত হইতে না পারেন, তাহার চেষ্টা আন্তর্জাতিক চক্র সর্বপ্রকারে করিয়াছে। ইসলামিক জেহাদি গোষ্ঠী প্রকাশ্যেই প্রধানমন্ত্রীকে প্রাণে মারিবার হুমকি দিয়াছে। এতকিছু সত্ত্বেও নরেন্দ্র মোদী কিন্তু দমিবার পাত্র নহেন। তিনি বলিয়াছেন, দেশবাসী তাঁহার সঙ্গে রহিয়াছেন। তাঁহারাই সর্বপ্রকার কুৎসার জবাব দিবেন এবং ষড়যন্ত্র বানচাল করিয়া দিবেন। দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলা যায় যে ভারতবাসীর মহাভাগ্য যে তাহারা নরেন্দ্র মোদীর মতো একজন প্রধানমন্ত্রী পাইয়াছেন। তাই তাঁহার বিরুদ্ধে সমস্ত রকম ষড়যন্ত্র দেশবাসীই ব্যর্থ করিয়া দিবেন।

সুভাষিতম্

প্রজাসুখে সুখং রাজ্ঞঃ প্রজানাং তু হিতে হিতম্।

নাত্মপ্রিয়ং হিতং রাজ্ঞঃ প্রজানাং তু প্রিয়ং হিতম্।

প্রজার সুখে রাজার সুখ আর প্রজার হিতেই রাজার হিত নিহিত। নিজের প্রিয় বিষয়ে রাজার হিত নেই, প্রজার যা কিছু প্রিয়, তাতেই রাজার হিত রয়েছে।

মমতা আগুনে আগুন দিয়েছেন তাই তাকে ফল ভুগতে হবে

নির্মাল্য মুখোপাধ্যায়

এই মুহূর্তে তৃণমূল কংগ্রেসের দুটি ফুল—তুষ্টিকরণ আর দুর্নীতি। দুটি ফুল ঝরিয়ে দেবার সুযোগ নেই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের। কেনই-বা দেবেন। তিনি তো জেনে বুঝে স্বেচ্ছায় আগুনে আগুন দিয়েছেন। শাস্ত্র বলে, আগুনে আগুন দিলে সুখ পালিয়ে যায়। আর ধ্বংস বাসা বাঁধে। এই মুহূর্তে যা বেঁধেছে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ঘরে আর তৃণমূল কংগ্রেসের অন্দরে। তদন্ত সংস্থার ফাঁস অনেকদিন আগে থেকেই মমতার গলায় চেপে বসেছিল। শীঘ্র তা আলগা হওয়ার সম্ভাবনা আছে বলে মনে হয় না। সামনে পঞ্চায়েত ভোট। পৌষমাসে নাগরিক আইন চালু হওয়ার সম্ভাবনাও দেখা দিয়েছে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নভেম্বর সফর দিয়েই হয়তো তার শুরু হবে। নাগরিক আইন চালু হলে মমতা যে সমস্যায় পড়বেন তা বলাবাহুল্য। আমার ধারণা মমতার তুষ্টিকরণের রাজনীতি চ্যালেঞ্জের মুখে পড়তে বাধ্য।

মমতা জানেন ৭৪ হাজারের বেশি আসনের পঞ্চায়েত নির্বাচন তাঁর ভাবিষ্যৎ ভাগ্য নির্ধারণের চাবিকাঠি। আগামীবছর মে বা জুন মাসে তা হতে পারে। তৃণমূল জনমানসে একটি ভ্রান্ত ধারণা তৈরির চেষ্টা চালাচ্ছে। তা হলো দুর্নীতি কেবল শহুরে বিষয়। গ্রামের ভোটে তার কোনো প্রভাব পড়ে না। কারণ বিভিন্ন ধরনের ত্রাণ আর অনুদান দিয়ে মমতা তাদের নিজের দিকে টেনে নিয়েছেন। সে দড়ি আলগা হবার নয়। এটা অপটু আর মূর্খ রাজনীতিকদের চিন্তা। চৌত্রিশ বছরে সিপিএম আর বামফ্রন্ট কোনোদিন কলকাতা থেকে রাজ্য চালায়নি। গ্রামবাঙ্গলায় ছিল তাদের মূল কেন্দ্র। অথচ ২০১১ সালের বিধানসভা ভোটে গ্রামবাঙ্গলায় তারা ধূলিসাৎ হয়ে যায়। ভেঙে যাওয়া কোমর আজও জোড়া লাগেনি।

এই রাজ্যে মমতার বুনিয়াদ ১২৮টি সংখ্যালঘু আসন যার অধিকাংশ গ্রামবাঙ্গলায় অর্থাৎ পঞ্চায়েত এলাকায়। এই অবস্থায় মমতার একমাত্র হাতিয়ার তুষ্টিকরণ। তবে মমতা বেকায়দায় রয়েছেন কারণ তাঁর নেতা-মন্ত্রী এখন জেলে। বহু নেতার বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ রয়েছে। তাঁর নিজের আর দলের ভাবমূর্তি অনেকটাই ভেঙে পড়েছে। মমতার নতুন কৌশল হলো মহিলা মুখ সামনে এনে পঞ্চায়েত ভোট পার হওয়া। অনেকে বলছেন এর কারণ তৃণমূলের মহিলা নেত্রী আর কর্মীদের বিরুদ্ধে কোনো দুর্নীতির আভিযোগ নেই। মহিলা নেত্রী আর কর্মীরা দলের ভাবমূর্তি তুলে ধরতে পুরুষদের তুলনায় অনেক বেশি যত্নবান। তাই মহিলা নৌকায় পঞ্চায়েত বৈতরণী পার হতে চাইছেন মমতা। আমার ধারণা কাজটা খুব সহজ হবে না। কারণ তৃণমূলের দুর্নীতির শিকড় গ্রামেগঞ্জে যেভাবে ছড়িয়েছে তাতে এসব ছলছুতো কোনো কাজে দেবে না।

মমতার নতুন কৌশল হলো মহিলা মুখ সামনে এনে পঞ্চায়েত ভোট পার হওয়া। অনেকে বলছেন এর কারণ তৃণমূলের মহিলা নেত্রী আর কর্মীদের বিরুদ্ধে কোনো দুর্নীতির আভিযোগ নেই। মহিলা নেত্রী আর কর্মীরা দলের ভাবমূর্তি তুলে ধরতে পুরুষদের তুলনায় অনেক বেশি যত্নবান। তাই মহিলা নৌকায় পঞ্চায়েত বৈতরণী পার হতে চাইছেন মমতা।

২০২১-এর ভোটে ভোট-পরামর্শদাতা সংস্থা আইপ্যাকের বুদ্ধিতে ২৩ জেলা কমিটির মধ্যে ১৯ জেলা কমিটি পালটে ফেলেছিলেন মমতা। মমতার কাছে তাদের বিরুদ্ধে দুর্নীতির প্রমাণ দিয়েছিল আইপ্যাক। তাদের অনেকে বিজেপিতে যোগ দেয়। তাতে বিজেপির ভরাডুবি হয়। এবারও সেই ধরনের কৌশল ফাঁদছেন মমতা। আচার্য চাণক্য বলেছেন কেন আদর্শ রাজা হতে গেলে চরবৃত্তির প্রয়োজন। তাকে এক ধরনের সাধুগিরি বলা চলে। তাই বোধ হয় মমতা রাজ্যের প্রধান বিরোধী দল বিজেপির ভিতর চর ঢুকিয়ে দিয়েছেন। বিশ্লেষকরা বলেন সিপিএমের দুর্গ নাকি আদর্শ দিয়ে গড়া। তাই তা ভাঙা কঠিন। বিজেপিও একটি কড়া আদর্শবাদী দল। তবে মমতাকে হঠাতে তারা আপাতত তা শিকেয় তুলে রেখেছেন। শুধু নিজেদের 'মমতা হটাও বাংলা বাঁচাও' স্লোগানে স্নাত রেখেছেন।

তৃণমূলের প্রাথমিক ধারণা পঞ্চায়েত ভোটে মমতা ৭০ শতাংশ আসন পাবেন। বিরোধীদের মধ্যে বিজেপি ১৫-১৬ হাজার আর বামেরা আনুমানিক ৬-৭ হাজার আসন পাবে। মমতা বিলক্ষণ জানেন কীভাবে ২০০৮-এর পঞ্চায়েত ভোটে বিদায় ঘণ্টা বেজেছিল সিপিএম শাসনের। আবার অনেকটাই আশঙ্কায়ও রয়েছেন মমতা, কারণ সিপিএমের শেষ দিনের কিছু ভূত তাঁর দলের মধ্যেও ঢুকে পড়েছে। ফলে মানুষ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়া খুব স্বাভাবিক। গ্রামবাঙ্গলায় সিপিএম দৈহিক অত্যাচার শুরু করেছিল। মমতার লেকেরাও তাই করছেন। তাই শঙ্কিত মমতা। তিনি আগুন নিয়ে খেলছেন। আগুনে আগুন লাগিয়ে তার তাপ পোহাতে গিয়ে সেই আঁচে পুড়ে যেতে চলেছেন মমতা।

শাঁখা সিঙ্গুরের দিব্যি.....

সর্বকার্যেষু দিদি,

দীপাবলীর শুভেচ্ছা।

আমি বিশ্বাস করি আপনিই এই বাংলার অধীশ্বরী। আপনার কথা, সরি, অনুপ্রেরণা ছাড়া এই বাঙ্গলায় গাছের পাতাও নড়ে না। এই যে করুণাময়ী থেকে চাকরিপ্রার্থীদের অবস্থান পুলিশ জোর করে তুলে দিল, তাতেও আপনি না থেকেও ছিলেন। আপনি তো আসল দিদি। আপনার অনুপ্রেরণা ছাড়া আদৌ কি সম্ভব?

কিন্তু দিদি, আমি ভাবি আপনি কত উদার। নিজে করেও কোনো কিছুর কৃতিত্ব নিতে চান না। এই যে সেদিন আপনি বললেন। আমি অবাক হয়ে শুনলাম। টিভিতে আপনি যখন বলছিলেন তখন ভাবছিলাম, কত উদারতা থাকলে এমন করে নিজের কাজের দায় অন্যকে দিয়ে দেওয়া যায়।

দেখলাম এবং শুনলাম, আপনি বলছেন, '' আমি সিঙ্গুর থেকে টাটাকে সরাইনি।" আপনার এই উদারতা না বুঝে গোটা বাংলা আপনার কথায় হাসছে। বলছে, অষ্টম শ্রেণীর ইতিহাস বই দেখলে ছোটো ছোটো ছেলে-মেয়েরাও হাসবে। সেখানে বড়ো বড়ো করে লেখা রয়েছে সিঙ্গুরে ঠিক কী করেছিলেন আপনি। সেই অধ্যায়ে এখন জেলে থাকা পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের কথাও রয়েছে। আরও এমন অনেকের নাম রয়েছে যাঁদের সঙ্গে আপনি সম্পর্কের কথা মানতেই চান না। এসবও বলছে যে, উনি তো অনেক বই লিখেছেন। 'উপলব্ধি' বলেও একটা বই রয়েছে। রাজ্যে কেউ সেগুলো পড়ে কিনা জানি না। আমি কিন্তু পড়েছি দিদি। তবে লোকজন বলছে, আপনার কথা শুনে সবার নাকি একটা বড়ো উপলব্ধি হয়েছে। সেটা হলো এবার আপনার আর একটা বই লেখা উচিত। যেটার নাম হবে, 'আমি কিছু করিনি'। কয়লা থেকে, গোরু থেকে, লটারি থেকে, সরকারি মদ থেকে ভাইপো টাকা তুলছে। আমি কিছু করিনি। পার্থ, মানিক চাকরি বিক্রি করেছে। আমি কিছু করিনি। ভোটের পরে তৃণমূল বিজেপি কর্মীদের খুন করেছে। আমি তো কিছু করিনি। কেন্দ্রের টাকা নিজের নামে চালানো হয়েছে। আমি তো কিছু করিনি। কিছুই না। এটাও বলছে, আপনি নাকি শুধু করতে বলেছেন। বলে দিয়েছেন, কোথা থেকে টাকা তুলতে হবে, কোথায় লুকিয়ে রাখতে হবে, কাকে মারতে হবে, কী করে বিরোধীদলের প্রার্থীকে হুমকি দিতে হবে, আগুন লাগাতে হবে, সবই বলেছেন, নির্দেশ দিয়েছেন।

আর কেউ না মানুক দিদি, 'শাঁখা সিঙ্গুরের দিব্যি' খেয়ে বলছি দিদি, আমি মনে করি, আপনি কিছুই করেননি। শুধু তাই নয়, আপনি কিছুই জানতেন না।

বামেরা বাংলার মেরুদণ্ড ভেঙে দিয়েছিল। আর আপনি নাকি সেই মেরুদণ্ডও খুলে বিক্রি করে দিয়েছেন। পুলিশকে আগেই করেছেন, আমলাদেরও করেছেন, এবার আপনি পুজো কমিটিগুলোকে দলদাস বানাচ্ছেন।

আপনার পুলিশও জানতে পারেনি দিনের পর দিন কলকাতায় তৃণমূল নেতাদের বাড়িগুলো সব অলক্ষ্মীর ভাণ্ডার হয়ে গিয়েছে।

জানেন দিদি, সেদিন এই কথাগুলো আমি পাড়ার এক চায়ের দোকানে বলেছিলাম। আমায় সবাই মিলে তেড়ে মারতে এলো। ওরা বলছিল, উনি কিছু কিছু কাজ অবশ্য করেছেন। কী কী করেছেন? কেন্দ্রীয় সরকার যে যে কাজগুলো করেছে এবং করে চলেছে সেগুলো নিজের বলে চালিয়েছেন। চালিয়ে চলেছেন। কেন্দ্র রেশন দেয় এটা সবার জানা। উনি বলেছেন, আমি দুয়ারে রেশন দিয়েছি। আমি প্রধানমন্ত্রীর আবাস যোজনার টাকায় বাংলায় বাড়ি করে দিয়েছি। আমি রাস্তা বানিয়ে দিয়েছি। এমনকী মা দুর্গাকে নিয়েও তিনি নিজের কৃতিত্ব দাবি করেছেন। আমি ইউনেস্কোর থেকে দুর্গাপুজোর সম্মান এনে দিয়েছি। এ সবের বেলায় আমি আমি। আর কোনো কিছুর দায় এড়িয়ে যাওয়ার সময় শুধু 'আমি নই, আমি নই। ওটা পার্থ করেছে, ওটা কেষ্ট করেছে, ওটা মানিক করেছে।'

আরও বলছে দিদি। আপনার থেকে সব সুবিধা নেওয়া লোকগুলোই বলছে, আপনি বাংলার সর্বনাশ করেছেন। আপনি সরকারি কর্মচারীদের প্রাপ্য ডিএ থেকে বঞ্চিত করেছেন, বাংলাকে শিল্পশূন্য করেছেন। বামেরা বাংলার মেরুদণ্ড ভেঙে দিয়েছিল। আর আপনি নাকি সেই মেরুদণ্ডও খুলে বিক্রি করে দিয়েছেন। পুলিশকে আগেই করেছেন, আমলাদেরও করেছেন, এবার আপনি পুজো কমিটিগুলোকে দলদাস বানাচ্ছেন। পুজোয় অনুদান দিয়ে ওদের কিনে নিতে চাইছেন। বাধ্য করছেন আপনার অনুষ্ঠানে ভিড় বাড়ানোর জন্য।

আর শুনতে পারছি না দিদি। হে মা কালী, আমায় বধির করে দাও।

অতিথি কলম

অসীম আলি

সেই বিশ্বস্ত ব্যক্তিই নতুন প্রধান, আর দলও সেই প্রাচীন

সম্প্রতি বিপুল ঢক্কানিনাদের পর মলিকার্জ্জুন খাড়্গের কংগ্রেস দলের সভাপতি নির্বাচিত হওয়ার অর্থ কংগ্রেসে সেই দীর্ঘদিন ধরে স্থবির হয়ে থাকা দলীয় আমলাতান্ত্রিক কাঠামো অন্তত ২০২৪ সাল অবধি অটুট থাকবে। এই সূত্রে পরাজিত প্রার্থী শশী থারুর যদি পাশ্চাত্যের কোনো দেশে এমন প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নামতেন সেক্ষেত্রে তাঁর ফলাফল হয়তো আরও তুল্যমূল্য হতে পারত। তাঁর ক্ষেত্রে প্রথম সমস্যাই ছিল যে মার্কিন ডেমোক্রেটিক দলের সেদেশে নির্বাচনের প্রাথমিক প্রতিদ্বন্দ্বিতার সঙ্গে ভারতের কংগ্রেসে দলের কাঠামোগত কোনো মিল নেই। কেননা কংগ্রেসের সভাপতি নির্বাচনের ক্ষেত্রে দলের তৃণমূল স্তরের সদস্যদের কোনো ভূমিকা নেই। এটা ধাঁচার দিক থেকে অনেকটাই কোনো খাপ পঞ্চায়েতের মুল পরিচালক ঠিক করার মতোই। এর ফলে মনোনয়নপত্র জমা দেওয়ার দিনই মোটামুটি বোঝা গিয়েছিল শশীবাবুর বিশেষ আশা নেই। কেননা নির্বাচন প্রভাবিত করতে পারেন এমন কেষ্টবিষ্টুদের অধিকাংশই খাড়্গেকে ঘিরে প্রকাশ্যে ব্যস্ত থাকার চেষ্টা করেন।

এর অর্থ কোনো মতেই এই নয় যে কংগ্রেস প্রতিনিধিদের ভোটে কোনো রকমের কারচুপি হয়েছে। কিন্তু খাড়্গের প্রতি প্রভাবশালীদের খুল্লামখুল্লা আগাম আনুগত্য প্রদর্শন অধিকাংশ প্রদেশ কংগ্রেস প্রতিনিধিকেই সিগন্যাল দিয়েছিল যে কার দিকে গেলে সর্বোচ্চ অলিখিত নেতৃত্ব খুশি হবেন। কে তাঁর আর্শীবাদপুষ্ট যার জয় জরুরি। সেই জন্যই নজরে পড়ে কংগ্রেসের অভ্যন্তরীণ আমলাতান্ত্রিক কাঠামোর অপরিবর্তনীয় অবস্থা। বহু প্রবীণ কংগ্রেস নেতাই সোনিয়া গান্ধীর উত্থানের সময় কেন্দ্রীয় ও রাজ্যের কংগ্রেস অফিসগুলিতে কে কোথায় পদ অলংকৃত করবেন এই নিয়ে মিউজিকাল চেয়ার খেলায় মেতেছিলেন। এর বিপরীতে আজকের বিজেপি দলে সেই সময়কার অতি নগণ্য সংখ্যক নেতার অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যাবে। কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির সদস্যদের গড় বয়স ৬৮। ৫০ বছর বয়স হয়নি এমন নেতা পাওয়া যাবে না। থারুর তার প্রচারপর্বে বার বার জোর দিয়েছিলেন দলীয় প্রত্যেকটি স্তরে নির্বাচন করার ওপর। একই সঙ্গে একেবারে নীচু স্তর থেকে প্রতিনিধি নির্বাচন এবং প্রয়োজনে বাতিল করার অধিকার সদস্যদের দিতে হবে। প্রত্যেকটি তৃণমূল স্তরে সমর্থনহীন বৃদ্ধ নায়েবরা তা তিনি গান্ধী সমর্থক অম্বিকা সোনী বা প্রতিবাদী প্রবীণ 'তেইশ গোষ্ঠী' যার মধ্যে আনন্দ শর্মার মতো ব্যক্তিরা শুরুতেই আন্দাজ করেছিলেন শশী এক বিপদসঙ্কেত অর্থাৎ দলের মধ্যে গেড়ে বসা প্রাচীন অচলায়তন ভাঙা এবং তাজা রক্ত সঞ্চালনের চেষ্টা।

এই আন্দাজ থেকেই তারা আর গান্ধী পরিবারের মাথা নাড়ার অপেক্ষা করেনি, তারা নিশ্চিত ছিল সেখানকার সম্মতির। এর ফলে একবগ্গা হয়ে শুরু হয় শশী বিরোধী জোট তৈরি। তাঁকে একঘরে করে বৃদ্ধতন্ত্রের আবার মালিন গদিতে ফিরে আসা। একজন দুর্বল নেতাকে পছন্দ করে গদিতে বসানোর বিকৃতমনস্ক পুরস্কার গান্ধীদের ছাড়াই অনেক সময় দলীয় সংগঠকরা অতীতেও দিতেন।

মনে করুন, ১৯৯৬ সালে যখন ৭৬ বছর বয়সি সীতারাম কেশরী দীর্ঘকাল আগেই তার ন্যূনতম রাজনৈতিক সমর্থন তাঁর নিজের রাজ্য বিহারেও হারিয়েছেন, তাঁকে খুঁজে আনা হয়। সে সময় এই নিজস্ব মতামতহীন পরমত পরিচালিত মানুষটি তখন তুলনামূলকভাবে অনেক তরুণ শরদ পওয়ার বা রাজেশ পাইলটকে বৃদ্ধতন্ত্রের সমর্থনের জোরে আনায়াসে পরাজিত করেন। পরবর্তী সময়ে তিনি সম্পূর্ণ ক্রীড়নক কংগ্রেস সভাপতি হিসেবে বিতাড়িত হওয়ার আগে অবধি ঠুঁটো জগন্নাথ হয়ে কাটান। সোনিয়া গান্ধী কয়েক ঘণ্টার নোটিশে তাঁকে তাড়িয়ে নিজে ওই পদে বসে পড়েন।

মাথায় রাখতে হবে রাজীব মারা যাওয়ার পরবর্তী সময়ে গান্ধী পরিবারের কিন্তু কংগ্রেসের ওপর সেরকম কোনো কর্তৃত্ব ছিল না। কেননা সোনিয়া তখনও রাজনৈতিক জীবন শুরু করেননি। তাঁকে ঘিরে কোনো ধরনের ক্ষমতাকেন্দ্র যদি তৈরি হয়েও থাকত তা ছিল দলীয় অভ্যন্তরীণ বিভিন্ন পন্থীদের তাঁকে ঘিরে যদি বাড়তি শক্তি পাওয়া যায় কিনা এমন একটা পরীক্ষা মাত্র। তবে অবশ্যই খাড়্গের ক্ষেত্রে একটি বড়ো ব্যতিক্রম রয়েছে তিনি বহুবার জনতার ভোটে নির্বাচিত হয়েছেন। তাঁর কর্ণাটকে পর্যাপ্ত জনভিত্তি রয়েছে। সামাজিক কাজকর্মও তিনি নিজ রাজ্যে করে থাকেন। তিনি রাজ্যসভায় হল্লা করা জনভিত্তিহীন কোনো সীতারাম কেশরী ঘরানার প্রতিনিধি নন।

তবে খাড়্গের সবচেয়ে বড়ো সুবিধে হচ্ছে যে তিনি বহু ক্ষেত্রেই নিজেকে পরিস্থিতি অনুযায়ী খাপ খাইয়ে নিতে পারেন। এই ৮০ বছরের বৃদ্ধ নেতার ক্রিয়াকলাপের ওপর আরও কঠিন ধাঁচের নিজেকে সর্বদা নেতা মনে করা যে ব্যক্তিবর্গরা সভাপতি হতে পারলেন না তাঁরা শ্যেনদৃষ্টি রাখবেন। ফলে এমন পরিস্থিতি আসতে পারে যখন দাঁত থাকলেও খাড়্গে সে দাঁত ব্যবহার করবেন

না যাতে পরিস্থিতি সচল থাকে।

এই স্থিতাবস্থা ধরে রাখার প্রবণতা বা কার্যধারা কেবলমাত্র কংগ্রেস সভাপতির ইতিকর্তব্য নির্ধারণে প্রভাব ফেলে না, একই সঙ্গে সংগঠনের সর্বস্তরেই একটা গয়ংগচ্ছ পরিস্থিতি সৃষ্টি করে। আদতে এটি কংগ্রেস দলের বর্তমান সংস্কৃতি। ক্ষমতা দখল করতে, শাসন ক্ষমতায় ফিরতে যে নতুন উদ্যোগ প্রচেষ্টার প্রয়োজন তা নজরে পড়ে না। জরুরি অবস্থা জারির পর অর্ধশতাব্দী কেটে গেলেও দলের অভ্যন্তরে ভাবগত তেমন কোনো পরিবর্তন ছাপ ফেলতে পারেনি। আদর্শগত উথাল পাথালের মাধ্যমে পরিবর্তন না এলে নিত্যদিনের অবক্ষয়ী লড়াই গেহলট-পাইলট বর্ষব্যাপী রাজস্থানে যেমন চলছে, তেমনি চলবে। আর খাড়গের এই সভাপতি পদে আসীন হওয়া কোনোভাবে কিছুটা ভারসাম্য ধরে রাখার মতো আপাতদৃষ্ট পরিবর্তন হতে পারে।

একটি ক্ষয়িষ্ণু সংস্কৃতির দলের শীর্ষে একজন আদি কংগ্রেস শিক্ষায়তনে শিক্ষিত, যিনি বরাবরই দলের ওপরের গোষ্ঠীর দিকেই কম-বেশি ছিলেন, তাঁকেই আনা হয়েছে। নজর করলে দেখা যাবে ইন্দিরা ও রাজীব জমানায় যাঁরা কংগ্রেস রাজনীতিতে হাত পাকাতে এসেছিলেন তাঁরা বরাবরই পিঠ চাপড়া চাপড়ির রাজনীতিতেই স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করেছেন। দলের অভ্যন্তরে তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা, ক্ষুরধার রাজনৈতিক বিচক্ষণতার প্রদর্শনের মাধ্যমে দলকে, তার নীতিকে প্রসারিত করা— এসব তাঁদের বরাবরই না-পসন্দ। বরঞ্চ উচ্চমার্গের কৌতুক, কাউকে ছোটো করে দেখানো (মণিশঙ্কর আইয়ার, চিদাম্বরম) ইত্যাদিতে তাঁরা অনেক দক্ষ।

যতই থারুরের সমর্থকদের মধ্যবিত্ত শ্রেণীর একটা অংশমাত্র বলে উড়িয়ে দেওয়া হোক না কেন কংগ্রেসকে তার পুরনো সমর্থনের ভিত্তিভূমি ফিরে পেতে গেলে মতাদর্শ তৈরির দক্ষতায় পারদর্শী মধ্যবিত্তকে উপেক্ষা করার মতিভ্রম আগে পরিত্যাগ করতে হবে। থারুর তাঁর লড়াইয়ের মাধ্যমে একটি উচাকাঙ্ক্ষী মধ্যবিত্ত শ্রেণীর রাজনৈতিক অবস্থানকে তিনভাবে তুলে ধরেছেন।

(১) মধ্যবিত্ত শ্রেণীর থারুরের নিজের যেমন ওপরে ওঠবার উচ্চাকাঙ্ক্ষা আছে তীব্র লড়াইয়ের মাধ্যমে তাঁকে সমর্থন তাদেরও সম-ইচ্ছারই প্রতিফলন।

(২) মধ্যবিত্ত শ্রেণীর সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ ও মত বিনিময় করে হিন্দুত্ব ও জাতীয়তাবাদ সম্পর্কে তাদের অজ্ঞতা বা ধন্দ দুর করা। সরাসরি তাদের পৃষ্ঠপোষকতা করা বা কোনো নির্দিষ্ট ধর্মীয় শ্রেণীকে তোল্লাই না দেওয়া, একটি মধ্যপন্থা বেছে নেওয়া। মধ্যবিত্ত শ্রেণীকে রাজনীতি বৃত্তের কেন্দ্রবিন্দুতে আনার এ যাবৎ অপরিক্ষিত প্রচেষ্টা।

(৩) হায়! অন্যদিকে কংগ্রেসের বৃদ্ধতন্ত্র মনে প্রাণে চাইছেন যে দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা আরও খারাপ হোক বা না হলেও যেন তেন প্রকারেণ তাকে খারাপ দেখানো হোক যাতে মনমোহন জমানার ইউপিএ শাসনের কর্মনাশা বছরগুলি আবার তাদের কোলে এসে পড়ে। সে বড়ো সুখের সময়। কিন্তু তার জন্য বাড়তি কোনোপথ উদ্ভাবনের কষ্ট নেওয়া যাবে না।

হ্যাঁ, এই জন্যই গান্ধীদের পছন্দসই খাড়গের এই সর্বোচ্চপদে উন্নীত। ফলে সর্বদা তিনি তাঁদের মনমর্জির ওপর অনেকটাই নির্ভর থাকবেন। ফলে দলের গুরুত্বপূর্ণ সংস্কার যদি তাঁর মনে কিছু থেকেও থাকে তা তিনি স্বাধীনভাবে রূপায়িত করতে পারবেন না। রাহুল গান্ধীর ভারত জোড়ো যাত্রা বাছাই রাজ্যে বীরবিক্রমে চললেও দলের 'উদয়পুর সম্মেলনে' নেওয়া সংস্কার প্রতিজ্ঞাগুলি ঠাণ্ডা ঘরে চলে গেছে। এই পরিপ্রেক্ষিতে কংগ্রেসের বহু শোরগোল তোলা সভাপতি নির্বাচনে বাস্তবে স্থিতাবস্থা চালুরাখা নেতৃত্বকেই রাখা হয়েছে ২০২৪ পর্যন্ত অবশ্যই। অন্য কোনোভাবে দলকে পুনরুদ্ধার করার কঠিন কাজ সব ২০২৪-এর পর ভাবা যাবে।

(লেখক রাজনৈতিক বিশ্লেষক)

শোকসংবাদ

রায়গঞ্জ নগরের প্রবীণ স্বয়ংসেবক সুরেন্দ্র আগরওয়াল গত ২০ অক্টোবর নিজ বাসভবনে পরলোকগমন করেন। তিনি গত দু' বছর যাবৎ দুরারোগ্য ক্যান্সার রোগে আক্রান্ত ছিলেন। তিনি প্রথম বর্ষ সঙ্ঘ শিক্ষা প্রাপ্ত স্বয়ংসেবক। তিনি স্ত্রী, একমাত্র পুত্র, তিন কন্যা ও নাতি-নাতনিদের রেখে গেছেন। তাঁর পিতা রাম নিবাস আগরওয়াল রায়গঞ্জের প্রথম দিকের স্বয়ংসেবক। তিনি একজন প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী ছিলেন। জনসঙ্ঘের সক্রিয় কর্মী ছিলেন। সুরেন্দ্রনাথ আগরওয়ালের ছোটো ভাই মহেন্দ্র আগরওয়ালও (মুন্নাদা) স্বয়ংসেবক। সুরেনদা প্রবীণ প্রচারকদের খুব প্রিয় ছিলেন। সব সময় সঙ্ঘের বিপদে আপদে তিনি সক্রিয় সহযোগিতা করতেন।

* * *

তাম্রলিপ্ত জেলার পাঁশকুড়া খণ্ডের স্বয়ংসেবক সৌরভ মাইতির দাদু অনাদিচরণ মাইতি ৮৫ বছর বয়সে গত ৯ অক্টোবর পরলোকগমন করেন। তিনি স্ত্রী, দুই পুত্র, এক কন্যা ও নাতি-নাতনিদের রেখে গেছেন।

* * *

তাম্রলিপ্ত জেলার নন্দকুমার খণ্ডের নরঘাটের প্রবীণ স্বয়ংসেবক কানাইলাল মাইতি গত ১৮ অক্টোবর পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৮ বছর। তিনি তাঁর স্ত্রী, ১ পুত্র, পুত্রবধূ ও নাতি-নাতনিদের রেখে গেছেন। তাঁর একমাত্র পুত্র প্রবাল মাইতি তাম্রলিপ্ত জেলার লঘু উদ্যোগ ভারতীর জেলা সংযোজক।

* * *

তাম্রলিপ্ত জেলার নন্দীগ্রাম খণ্ডের খণ্ড শারীরিক প্রমুখ অভিজিৎ প্রামাণিকের দাদু প্রত্যুষ পাল ৭৫ বছর বয়সে গত ২৪ অক্টোবর পরলোকগমন করেন। তিনি ৪ কন্যা ও নাতি-নাতনিদের রেখে গেছেন।

* * *

কলকাতা দক্ষিণ-পূর্ব বিভাগের বৌদ্ধিক প্রমুখ মধুসূদন করের পিতৃদেব রেবতীমোহন কর গত ২৮ অক্টোবর পূর্ব মেদিনীপুর জেলার চোদ্দচুলী গ্রামের বাড়িতে পরলোকগমন করেন। তিনি তাঁর সহধর্মিণী, ৬ পুত্র, ৪ কন্যা ও নাতি-নাতনিদের রেখে গেছেন।

কলমধারী মাওবাদীদের নিয়ে মোদীর বার্তায় বিরোধীদের গোঁসা

অক্টোবরের শেষ সপ্তাহে দিল্লি সংলগ্ন হরিয়ানার ফরিদাবাদের সূরযকুণ্ডে দেশের সমস্ত অঙ্গরাজ্যের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীদের বৈঠকে বক্তৃতা দিতে গিয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, শুধু অস্ত্রধারী মাওবাদীরাই নয়, কলমধারী মাওবাদীরাও সমান বিপজ্জনক। প্রধানমন্ত্রীর এই বক্তব্য বাস্তব পরিস্থিতির সঙ্গে এতোটাই সামঞ্জস্যপূর্ণ যে বিতর্কের সুযোগ বিশেষ নেই। কিন্তু তা সত্ত্বেও এনিয়ে বিতর্ক বেশ জাঁকিয়ে উঠেছে। কোনো কোনো মহল আবার প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্যের মধ্যে গণতন্ত্র বিপন্নতারও গন্ধ পাচ্ছে। এই ধরনের গণতন্ত্র বিপন্নতার ধুয়ো মোদী- জমানায় ইতিপূর্বে দেশবাসী বহুবার দেখেছে। সুতরাং এতে কোনো নতুনত্ব নেই। কিন্তু প্রধানমন্ত্রী যে বিষয়ের অবতারণা করেছেন, তার গুরুত্ব সঠিকভাবে অনুধাবন না করতে পারলে বা তাঁর বক্তব্যে যাঁরা গণতান্ত্রিকতা বিপন্নের ধুয়ো তুলছেন, তাঁদের প্রশ্রয় দিলে অর্থাৎ ভাবের ঘরে চুরি করার সুযোগ দিলে ভারতে গণতন্ত্র যে খাদের কিনারায় গিয়ে দাঁড়াবে তা বলাই বাহুল্য।

মাওবাদী বলতে আমরা কাদের বুঝি? এর অভিধানিক অর্থ হলো, যারা একদা চীনের দোর্দণ্ডপ্রতাপ শাসক মাও জে দঙের অনুগামী ছিলেন। ভারতে বিশেষ করে বাঙ্গলায় এদের তাণ্ডব কী নৃশংস পর্যায়ে যেতে পারে ভারতবাসী তার সাক্ষী হয়েছিলেন ১৯৬৭ সালের নকশালবাড়ি আন্দোলনের সময়। পরবর্তী ৫৫ বছরে ঝাড়খণ্ড, ছত্তিশগড়, আমাদের পশ্চিমবঙ্গ তো বটেই, এছাড়াও ভারতের বিভিন্ন প্রান্তের মানুষ এই মতাদর্শের তাণ্ডব দেখেছেন, নিরীহ ভারতবাসীকে এদের হাতে প্রাণ দিতে দেখেছেন। এমনকী দেশের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিংহও তাঁর প্রধানমন্ত্রিত্বের সময়কালে মাওবাদকে ভারতের প্রধান বিপদ বলে স্বীকার করে নিয়েছিলেন।

একথা আমাদের মানতেই হবে, ভারতে মাওবাদীরা শুধু সন্ত্রাসেই মদত দেয় না, বিভিন্ন সন্ত্রাসবাদী শক্তিকে তারা ভারতের বিরুদ্ধে প্ররোচিত করে। তা দেশের অভ্যন্তরে বিচ্ছিন্নতাবাদী শক্তি হোক কিংবা মাওবাদীদের ধাত্রীভূমি চীন ও চীনের দোসর পাকিস্তানই হোক বা বৈদেশিক কোনো সন্ত্রাসবাদী শক্তিই হোক, সব মিলিয়ে মাওবাদীদের বিপজ্জনকতা ভালোমতন টের পাওয়া যায়।

আরও একটা বিষয়, শুধু সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপ পরিচালনায় নয়, কখনো রাষ্ট্রযন্ত্রের শোষণের গল্প শুনিয়ে, কখনো-বা ভারতের বিকৃত মানচিত্র প্রকাশের মাধ্যমে বিচ্ছিন্নতাবাদকে সমর্থন করে বা দেশের নিদারুণ দারিদ্রের গল্প ফেঁদে (মনে করিয়ে দিই, দেশের হতদরিদ্র মানুষের ওপর এই মাওবাদীরাও কম শোষণ, অত্যাচার করেনি) তারা দেশের মানুষকে দেশের বিরুদ্ধে যাওয়ার প্ররোচনা দিয়ে গিয়েছে বারবার। মাওবাদীদের এই ভারতবিরোধী প্রবণতা আগেও ছিল, কিন্তু বিশ্বজুড়েই কমিউনিজমের দাপট অস্তমিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ভারতেও মাওবাদীদের প্রভাব, অন্তত বৌদ্ধিক ক্ষেত্রে কমতে থাকে। যেটুকু অস্তিত্ব তারা জাহির করতো, তা মূলত নাশকতামূলক কাজকর্মের সূত্রে।

কেন্দ্রে মোদী সরকার ক্ষমতায় আসার পরে দেশজুড়ে অভূতপূর্ব রাজনৈতিক পরিস্থিতির উদ্ভব হয়। স্বাধীনতার পর দেশে অধিকাংশ সময় রাজত্ব করা কংগ্রেস শুধু যে ক্ষমতাচ্যুত হয়েছে তাই নয়, প্রধান বিরোধী শক্তিরও মর্যাদা হারায়। অন্য বিরোধী শক্তিরও হাঁড়ির হাল হয়েছে। হাতে গোনা কয়েকটি মাত্র রাজ্যে বিচ্ছিন্নতাবাদকে মদত দিয়ে ভেসে ওঠার চেষ্টা করে তারা। আর ভারতের এই নবোদ্ভূত রাজনৈতিক পরিস্থিতির সুযোগ নিয়ে মাওবাদীরা এই মোদী-বিরোধী রাজনৈতিক শক্তির পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করে।

মাওবাদী সন্ত্রাস দমনে মোদী সরকার বরাবরই কঠোর অবস্থান নিয়েছে। কিন্তু বাকস্বাধীনতার শিখণ্ডী খাড়া করে মোদী বিরোধীরা পত্রপত্রিকা, বইপত্রের মাধ্যমে মাওবাদকে, আধুনিক ব্যবসায়িক পরিভাষায় বিভিন্ন প্যাকেজিঙের মাধ্যমে উৎসাহিত করে চলেছে। এমনকী গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় বিশ্বাসী বলে কথিত কমিউনিস্টরাও অবস্থা বেগতিক বুঝে চরমপন্থাকে আশ্রয় করেছে।

একটা প্রসঙ্গ এই ক্ষেত্রে বারবার ওঠে। মোদী-বিরোধিতা এবং রাষ্ট্র-বিরোধিতা এক নয়। কিন্তু মাওবাদীদের প্রভাব থাকার জন্যই সম্ভবত দেশের নির্বাচিত প্রধানমন্ত্রীর নিছক রাজনৈতিক স্বার্থে বিরোধিতা করতে গিয়ে তাঁরা দেশের স্বার্থবিরোধী হয়ে উঠেছেন। মাওবাদী সন্দেহে ধৃত দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক জিএন সাইবাবার জামিন দিতে গিয়ে সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি এম আর শাহ বলেছেন, 'মানুষের ক্ষেত্রে প্রধান বিপজ্জনক বস্তু হলো মস্তিষ্ক, আর মাওবাদীদের ক্ষেত্রে এই মস্তিষ্কই হলো মূল।' সুতরাং 'কলমধারী মাওবাদী'দের প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রাখতে সচেতন যুবসমাজের প্রতি প্রধানমন্ত্রীর এই আহ্বান দেশের অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তার স্বার্থেই, তা নিয়ে বিতর্কের কোনও সুযোগ নেই। □

মাননীয়া কেন বললেন, আমি তো কলা খাইনি?

সুজিত রায়

বিশ্বকবি ও মহান দার্শনিক রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর লিখে গেছেন, ''ভৌতিক সত্যকে বিশুদ্ধ করে দেখতে গেলে কাছের সমস্ত মলিনতা ও চাঞ্চল্য, ব্যক্তিগত সমস্ত বিকার দুর করা চাই। আত্মিক সত্য সম্বন্ধে সে কথা আরও বেশি খাটে। যখন পশুসত্তার বিকার আমরা আত্মিক সত্যে আরোপ করি তখন সেই প্রমাদ সবচেয়ে সাংঘাতিক হয়ে ওঠে। .....তখন বুঝতে পারি বিজ্ঞানের সাহায্যে যে শক্তিকে আমরা আয়ত্ত করেছি সেই শক্তিই মানুষের হিংসা ও লোভের কারণ হয়ে তার আত্মঘাতকে বিস্তার করছে.....।''

এই সব জ্ঞানদগ্ধ বাণীগুলো রাজ্যের শাসক দল এবং রাজ্য সরকারের প্রধানার কাছে হয়তো 'মাস্টারি ফলানো' বলেই মনে হবে। কিন্তু বাস্তব ঘটনাটা হলো, শাস্ত্রগ্রন্থে কিংবা রবীন্দ্রনাথে অসত্য থেকে যে পাপবোধের কথা বলা হয়েছে, অতি সম্প্রতি জেনেবুঝেই সেই পাপে আকণ্ঠ নিমজ্জমান হয়ে গেছেন মাননীয়া। কারণ তিনি প্রকাশ্য সমাবেশে, দিবালোকে, সহস্র মানুষের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে চরম অসত্য বিবৃতিই দিয়ে দিয়েছেন—

''আমি নই, টাটাকে সিঙ্গুর থেকে তাড়িয়েছে সি পি এম'' এবং যথারীতি এই বিবৃতি কয়েকদিনে মিডিয়ার পাতে বিরিয়ানি হয়ে পরিবেশিত হয়েছে। সোশ্যাল মিডিয়ায় চলছে আমোদ- প্রমোদ, মিমিক্রি, মিম থেকে শুরু করে নানান বিদ্বেষপূর্ণ মজাদার বিবৃতি।

কিন্তু প্রশ্ন হলো, টাটারা সিঙ্গুরের ন্যানো প্রকল্প গুটিয়ে নিয়েছিলেন ২০০৮ সালের ৩ অক্টোবর। আজ ১৪ বছর ১৬ দিনের মাথায় সেই ঘটনা স্মরণ করিয়ে মাননীয়া ঠিক কী কার্যসিদ্ধি করতে চাইলেন? কেনই-বা জোর গলায় অত বড়ো মিথ্যাটা নিজের জিভ দিয়ে উচ্চারণ করলেন ?

সাধারণ মানুষের মধ্যে পাটিগণিত, বীজগণিত, জ্যামিতি, ত্রিকোণমিতি সবকিছু মিলে গিয়ে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করলেও, আসল অঙ্কটা মাননীয়া ঠিকই কষেছেন এবং ঝোপ বুঝে কোপও মেরেছেন সপাটে। একেবারে ছক্কা।

মানুষের নিশ্চয়ই স্মরণে আছে, বামফ্রন্ট রাজত্বের শেষ পর্যায়ে যখন বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য মুখ্যমন্ত্রী তখন টাটা সাম্রাজ্যের অধিকারী রতন টাটা কমপ্যাক্ট কার ন্যানো মোটরগাড়ি তৈরির প্রস্তাব নিয়ে হাজির হয়েছিলেন এরাজ্যে। প্রায় শিল্পবর্জিত পশ্চিমবঙ্গে এহেন একটি প্রকল্পের স্বেচ্ছা-আগমনকে স্বাগত জানাতে দেরি করেননি মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য এবং তড়িঘড়ি দুর্গাপুর এক্সপ্রেসওয়ের ধারঘেঁষা সিঙ্গুরের দো-ফসলি, তিন-ফসলি ৯৯৭ একর জমি

গত ১৪ বছরে রাজ্যে নতুন শিল্প আসেনি। একটাই কারণ রতন টাটার মতো শিল্পপতি হাত পোড়তে না চেয়ে সরে গেছেন। আর কে আসবে হাত পোড়াতে। ফলে রাজ্য সরকারকে কুমিরছানার মতো বারবার দেখাতে হচ্ছে দেওচা-পাঁচামির কয়লা প্রকল্প আর তাজপুরের বন্দর প্রকল্প। দুটোই কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকারের নির্ধারিত প্রকল্প।

অধিগ্রহণ করে নামমাত্র মূল্যে দীর্ঘমেয়াদি লিজ আকারে ১৮৯৪ সালের জমি অধিগ্রহণ আইনকে মাদুলি করে নিয়ে রতন টাটার হাতে তুলে দেন। পুরস্কারের সঙ্গে ফুলের বোকে হিসেবে ছিল আরও অনেক কিছু সুযোগ সুবিধা।

তখন রাজ্যে বিরোধী নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তৃণমূল কংগ্রেসের একচ্ছত্র অধিপতি। তিনি সরকারের এই সদিচ্ছার হিসেব নিকেশের গলদগুলোকে খুঁজে বার করলেন এবং দেখলেন, হাজার কোটি টাকার বিনিয়োগের এই প্রকল্প সত্যিসত্যিই খাড়া হয়ে গেলে, তাঁর ক্ষমতায় আসীন হওয়া তো দূরের কথা, বামফ্রন্ট জাঁকিয়ে আরও ৩৫ বছর গেড়ে বসে থাকবে এরাজ্যে শাসক দলের ভূমিকায়। তাই গলদের ওপর ভর করেই নেমে পড়লেন ময়দানে। চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিলেন, প্রায় ৩০ শতাংশ জমির মালিকের ইচ্ছের বিরুদ্ধে জোর করে কেড়ে নেওয়া হচ্ছে সারাবাছর ধরে খোরাক জোগানো চাষের জমি।

শুরু হয়ে গেল লোক খেপানো বিক্ষোভ। হাত মেলালো তথাকথিত নকশালপন্থীরা, যারা এতদিন না ঘরকা না ঘটকা হয়ে পড়েছিলেন কোথায় কেউ জানে না। বিরোধী নেত্রী যে তাদের শরণাপন্ন হলেন শুধু তাই নয়, বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের চারপাশ ঘিরে থাকা শিক্ষিত পণ্ডিত বুদ্ধিজীবদের জনে জনে ডেকে নিলেন তথাকথিত সিঙ্গুর গণ-আন্দোলনের ময়দানে। তথাকথিত বলছি, কারণ সিঙ্গুর আন্দোলন কখনই গণ-আন্দোলন হয়ে ওঠেনি। তখন সিঙ্গুরের মাঠে দিনরাত উড়ছে টাকা। জমে গেছে টাকার পাহাড়। জমি কেনার হিড়িক পড়ে গেছে। চাষির মাটির দেওয়ালের সামনে দাঁড়িয়ে ঝকঝকে মারুতি। নিত্যনতুন গজিয়ে উঠছে সরকারি বেসরকারি ব্যাঙ্কের শাখা। গরিব মানুষ বাঙ্গলার বুকে মিনি টাটানগর পাওয়ার আশায় স্বপ্ন দেখছেন, তারা দুহাতে

ফঃ ২

রোজগার করছেন—সুখের সে দিন বুঝি বেশি দূরে নয়।

কিন্তু কে জানত—সুখ নয়, ঘনিয়ে আসছে অসুখের দিন। আগুন, গুলি, বোমা বর্ষণ, মারদাঙ্গা, চোরাগোপ্তা খুনের রক্তে ঘামে ভিজে গেল সিঙ্গুরের মাটি, যে মাটিতে ততক্ষণে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে পড়েছে বিশাল কারখানার প্রায় সম্পূর্ণ পরিকাঠামো। আর পাশেই দুর্গাপুর এক্সপ্রেসওয়ে তথা জাতীয় সড়কের একাংশকে ঘিরে চলছে তথাকথিত নয়া তেভাগা আন্দোলনের বিক্ষোভ—টানা ২৬ দিন। রাতদিন, মাননীয়ার নেতৃত্বে। বোঝাই যাচ্ছিল, অন্ধকার ঘনিয়ে আসছে। শেষ পর্যন্ত তাই হলো। চরম অশান্তিকর ও ভীতিপ্রদ হিংসার আন্দোলনের মোকাবিলায় না গিয়ে ঠাণ্ডা মাথার সোজা মেরুদণ্ডের শ্রেষ্ঠ ভরতীয় শিল্পপতি রতন টাটা প্রকাশ্যে ঘোষণা করেই দিলেন ২০০৮ সালের ৩ মে—''আমি বলেছিলাম, মাথায় বন্ধুক ঠেকালেও যাব না। কিন্তু মমতা তো ট্রিগার টিপে দিলেন।''

না, রতন টাটা একটা ইটও সিঙ্গুর থেকে ফেরত নিয়ে যাননি। প্রায় চোদ্দ হাজার কোটি টাকা লোকসান করে নতুন কারখানা করতে চলে গিয়েছিলেন গুজরাটের আনন্দে। তখন গুজরাটের মুখ্যমন্ত্রী নরেন্দ্র দামোদরদাস মোদী। আজকের প্রধানমন্ত্রী।

পরের পর্বটা ছিল আরও ভয়াবহ। রাজ্য সরকারের প্রতিহিংসার রাজনীতি বিশাল বিশাল মাইন বিস্ফোরণ ঘটিয়ে ভেঙে ফেলল ওই শিল্প কারখানার ইমারত। মুখ্যমন্ত্রী ঘোষণা করলেন, জমিকে চাষযোগ্য করে তুলে দেবেন চাষিদের হাতে। কারণ ততদিনে শীর্ষ আদালতের রায়ও গেছে রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে জমি অধিগ্রহণের ত্রুটির ভিত্তিতে। অগত্যা, সামনের নির্বাচনে বামেদের বিদায়। আগমন তৃণমূলের। হাজার হাজার ট্রাক নেমে পড়ল সিঙ্গুরের মাটিকে চাষযোগ্য করে তোলার জন্য। মুখ্যমন্ত্রী সেই মাটিতে সর্ষে ছড়ালেন। ফল কী হলো? চাষিরা আজও চোখে সর্ষেফুলই দেখছেন। কারণ কংক্রিটের জঞ্জালে পরিপূর্ণ সিঙ্গুরের মাটি আর চাষযোগ্য নেই। সে তখন বন্ধ্যা নারী। 'গণ-আন্দোলন'-এর পরিণতিতে ভেসে গেল চাষির স্বপ্ন তাদের চোখের জলে।

নয় নয় করে এর মধ্যে চোদ্দটা বছর কেটে গেল। আজ হঠাৎ মুখ্যমন্ত্রীর মুখে এই ভাষণ কেন—'আমি নই, টাটাকে সিঙ্গুর থেকে তাড়িয়েছে সি পি এম।' এ তো অসত্য ভাষণ!

তা বটে! কিন্তু রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা জানেন, মাননীয়ার প্রতিটা পদক্ষেপের পিছনে থাকে একটা না একটা উদ্দেশ্যমূলক রাজনীতি যা বেশিরভাগ সময়েই নেতিবাচক। এক্ষেত্রে সেই উদ্দেশ্যটা কী?

গত প্রায় তিন মাস ধরে রাজ্যের আনাচকানাচ থেকে মিলছে কোটি কোটি টাকা। ট্রাঙ্ক বোঝাই, পুঁটলি বোঝাই, ঘরের মেঝেতে ডাঁই করে ফেলে রাখা পাহাড়প্রমাণ নোট। ইডি, সিবি আই-এর দরবারে ঘনঘন ডাক পড়ছে শাসক দলের নেতাদের। মন্ত্রী, নেতা জেলবন্দি হচ্ছেন। কীসের টাকা? স্কুল শিক্ষা দপ্তরের দুর্নীতির টাকা। ছ্যাঃ ছ্যাঃ ধ্বনিতে মুখর গোটা ভারত তো বটেই, বিদেশও। সোশ্যাল মিডিয়ার দেওয়াল জুড়ে হাসি-ঠাট্টা, রঙ্গতামাসা, দ্বেষ-বিদ্বেষ, রাজনৈতিক বিবৃতি আর বিরোধিতা। কবিতা আর ছড়ার ছড়াছড়ি।

এ অবস্থায় কী করবেন মাননীয়া?

যা করা উচিত তাই করেছেন। এমন একটা বিবৃতি দিয়েছেন, যা সারবত্তাহীন হলেও মানুষ খাবে, মিডিয়া গিলবে। আর রাতরাতি উধাও হয়ে যাবে দুর্নীতির সব অভিযোগ। যেমনটা আগেও ঘটেছে গত এগারো বছরে বারে বারে। নতুন আইটেম পেলে আর পুরনো আইটেমকে কে মনে রাখে?

উদ্দেশ্য আরও আছে। রাজ্যের শিল্পের পরিস্থিতি অবর্ণনীয়। গল্পবাজি যতই করুক সরকার, বেকারের চাকরির দরকার। ভাষণ শুনে তো পেট ভরবে না। সুতরাং এবারে শিল্পপতিদের মন ভেজাও। মাননীয়া জানেন, গত ১৪ বছরে রাজ্যে নতুন শিল্প আসেনি। একটাই কারণ রতন টাটার মতো শিল্পপতি হাত পোড়াতে না চেয়ে সরে গেছেন। আর কে আসবে হাত পোড়াতে। ফলে রাজ্য সরকারকে কুমিরছানার মতো বারবার দেখাতে হচ্ছে দেওচা-পাঁচামির কয়লা প্রকল্প আর তাজপুরের বন্দর প্রকল্প। দুটোই কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকারের নির্ধারিত প্রকল্প। বাস্তবায়িত করছেন নরেন্দ্র দামোদর মোদীর ঘনিষ্ঠবৃত্তের ব্যবসায়ী আদানি গোষ্ঠী। আর কেউ কি এসেছেন? আসেনি বললে অসত্য ভাষণ হবে। কিন্তু সবই চুনোপুঁটি। বলার মতো নয়। অগত্যা মাননীয়া কী করবেন? শিল্পপতিদের মন ভেজাতে তো বলতে হবেই—''আমি তো কলা খাইনি।'' মাননীয়া জানেন, দুদিন মানুষ হাসি ঠাট্টা করবে, তারপর সব থেমে যাবে নতুন কিছু নিয়ে। ওই বাচ্চাদের হাতে নিত্যনতুন খেলনা তুলে দিয়ে ভুলিয়ে রাখার মতো আর কী? ১৪ বছর পর সিঙ্গুর প্রসঙ্গকে টেনে আনার উদ্দেশ্য ওই ছেলেভুলানো খেলনার মতোই।

অসত্য বলে কি তাহলে পাপ করলেন মাননীয়া?

তোবা! তোবা! তা কেন হবে? অমন পাপের ভয় করলে কি এমন অসত্য ভাষণ দেওয়া যায়? যায় না। মাননীয়া সেটা জানেন। আরও জানেন একটা চরম সত্য—কখনও কখনও সত্যর চেয়ে মিথ্যার গুরুত্ব বেশি হয়। সত্যের চেয়ে মিথ্যা হয়ে ওঠে শ্রেয়। তখন মিথ্যা বললে সাজা হয় না। কখন আসে এমন মুহূর্ত? মহাভারতের কথা স্মরণ করি—পিতামহ ভীষ্ম যুধিষ্ঠিরকে দিক নির্দেশ করছেন। বললেন, যখন সত্য মিথ্যারূপে আর মিথ্যা সত্যরূপে প্রতিভাত হচ্ছে আমাদের সামনে, তখন সত্যর জায়গায় মিথ্যাই প্রকৃত সত্য হয়ে ওঠে। কেননা, তাতেই সর্বভূতের হিত সম্ভব। মাননীয়া এক্ষেত্রে সেই পথেই পা বাড়িয়েছেন। কারণ, সবাই না জানালেও, এ রাজ্যের অনেকেই জানেন, বাধা না দিলে শিল্প হয়তো হতো। কিন্তু সত্য যা তা হলো রাজ্যের হাজার একর বহুফসলি জমি চলে যেত। আরও সত্য, জমির সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য উপঢৌকনগুলি তো তৎকালীন সরকার প্রকাশ্যে আনেনি। সেও তো মিথ্যাচার! দু'পক্ষই পাপবিদ্ধ। অতএব এরকম একটা বিষময় পরিস্থিতিতে দাঁড়িয়ে দেরিতে হলেও মাননীয়া নারদ মুনিরই শরণাপন্ন হয়, যিনি বলেছিলেন—

সত্যস্য বচনং শ্রেয়ঃ সত্যাদপি হিতং বদেৎ।
যদ্ভূতহিতমত্যন্তম্ এতৎ সত্যং মতং মম।।

মোমিনপুরে জেহাদি হিংসা ধামাচাপা দেওয়ার চেষ্টা তৃণমূলের

সুদীপ নারায়ণ ঘোষ

গত ৮ অক্টোবর রাতে মিলাদ-উন-নবির পতাকা নিয়ে হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে সংঘর্ষ হয়। পরদিন রাতে একদল মুসলমান ময়ূরভঞ্জ ও ভূকৈলাশ সড়কে বহু হিন্দুর

বাড়িঘর ভাঙচুর করে। এর প্রতিবাদে লোকজন একবালপুর থানা ঘেরাও করে বলে স্থানীয়রা জানিয়েছেন এবং ৯ অক্টোবরে হিন্দুদের অনেক গাড়ি ধ্বংস করা হয়।

ওপইন্ডিয়া রিপোর্ট করেছে কীভাবে জেদাদিরা ৯ অক্টোবর সন্ধ্যায় মোমিনপুরের ময়লা ডিপোতে হিন্দুদের বাইক ও দোকান ভাঙচুর করেছে। ওপইন্ডিয়া জানতে পেরেছিল নবি মুহাম্মদের জন্মবার্ষিকীর আগে দুর্গা পূজার প্যান্ডেলগুলি সরাতে অস্বীকার করার জন্য হিন্দুরা মুসলমানদের লক্ষ্যবস্তু হয়েছিল। ৯ অক্টোবর হিন্দুরা যখন বার্ষিক লক্ষ্মী পূজা উদ্‌যাপনের জন্য প্রস্তুত হচ্ছিল তখন তারা মুসলমানদের জঘন্য আক্রমণের শিকার হয়, ওপইন্ডিয়া জানিয়েছে। এ যেন ১০ অক্টোবর, ১৯৪৬ নোয়াখালির ঘটনার পুনরাবৃত্তি, অন্তত প্রকৃতিতে।

এই ঘটনায় বিজেপি নেতারা কেন্দ্রীয় সরকারের হস্তক্ষেপ দাবি করেছেন। ১০ অক্টোবর সকালে পশ্চিমবঙ্গ বিজেপি সভাপতি সুকান্ত মজুমদারকে এলাকায় যাওয়ার পথে পুলিশ বাধা দেয়। লালবাজারের সেন্ট্রাল লকআপে মজুমদারের আটকের পরে, শুভেন্দু অধিকারী টুইট করেছেন, ''লজ্জা!! লজ্জা!! লজ্জাজনক মোমিনপুরের সহিংসতাকে কার্পেটের নিচে চাপা দেওয়ার জন্য, @Mamata Official @Kolkata Police কে @BJP4Bengal সভাপতি @DrSukantaBJP-কে মোমিনপুর যাওয়ার পথে চিংড়িঘাটায় গ্রেফতার করার নির্দেশ দিয়েছে। আপনি যত চেষ্টা করুন, কিন্তু আপনি বিজেপিকে থামাতে পারবেন না।''

শুভেন্দু অধিকারী টুইটে জানিয়েছেন, ''আমি মাননীয় কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রী অমিতশাহজী এবং মাননীয় রাজ্যপাল শ্রী এল এ গণেশনজীকে চিঠি দিয়েছি যেন তাঁরা পশ্চিমবঙ্গের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি হাতের বাইরে চলে যাওয়ার আগে মোমিনপুর হিংস্রতা এবং একবালপুর থানার লুটপাটের পরিপ্রেক্ষিতে জরুরিভাবে কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েন করেন।''

কলকাতা পুলিশের মতে, ১০ জনকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য আটক করা হয়েছে এবং ময়ূরভঞ্জ রোড এলাকায় বিপুল সংখ্যক পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে। বিজেপি নেতা ও লেখক স্বপন দাশগুপ্ত টুইট করেছেন, ''কলকাতার খিদিরপুর-একবালপুর অঞ্চলে হিন্দু সংখ্যালঘুদের ব্যবসা এবং সম্পত্তিকে লক্ষ্য করে হিংস্র জনতার সহিংসতা উদ্বেগজনক। এটি বিকৃত ক্ষমতায়ন থেকে উদ্ভূত, যে বিশ্বাসের ফলে একটি সম্প্রদায় আইন এবং নাগরিক দায়িত্বের আদর্শের ঊর্ধ্বে।'' 'তিনি আরও লিখেছেন', আমি সাম্প্রদায়িক পরিচয়ের এই কুৎসিত প্রকাশের মধ্য দিয়ে পশ্চিমবঙ্গের দুর্বল হিন্দু সমাজের মধ্যে যে আতঙ্কের সৃষ্টি হয়েছে তার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে প্রধানমন্ত্রীকে চিঠি দিয়েছি। এটা সম্পূর্ণভাবে মমতা সরকারের ভোটব্যাংকের হিসাব নিকাশের মাধ্যমে হিন্দুদের ফাঁসানো

হচ্ছে।

স্বৈরাচারী মুখ্যমন্ত্রী এবং টি এম সি নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশে পশ্চিমবঙ্গ পুলিশের বাড়াবাড়ির নিন্দা করে বিজেপি রাজ্য সভাপতি টুইট করেছেন, 'লজ্জাজনক যে মুখ্যমন্ত্রী মমতা অফিসিয়ালের অধীনে পশ্চিমবঙ্গের পুলিশ হিন্দু ভাই ও বোনদের রক্ষা করতে ব্যর্থ হয়েছে এবং যখন আমরা সহিংসতা কবলিত মোমিনপুর দেখতে যাচ্ছি তখন আমাকে গ্রেফতার করেছে'।

রাজ্যে হিন্দু বিরোধী অ্যাজেন্ডাকে উসকানি দেওয়ার জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সমালোচনা করে বিজেপি রাজ্য সভাপতি বলেছিলেন যে এটা পরিহাস যে পুলিশ টিএমসি গুন্ডা এবং মোল্লবাদীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার পরিবর্তে নিরপরাধ ব্যক্তিদের আটক করছে এবং মোমিনপুরে সাম্প্রতিক হিন্দু বিরোধী সহিংসতার সময় পুলিশ সাধারণ হিন্দুদের উপর হামলা চালিয়েছে। বিজেপি সভাপতি বলেছেন যে পশ্চিমবঙ্গকে পশ্চিম বাংলাদেশে রূপান্তরিত করার জন্য রাজ্য প্রশাসনের সহায়তায় একটি বড়ো ষড়যন্ত্র করা হচ্ছে। তিনি জোর দিয়েছেন যে মোমিনপুর ও ইকবালপুরের মতো মুসলমনে সংখ্যাগরিষ্ঠ অঞ্চলে টিএমসি গুন্ডারা উগ্রপন্থী মুসলমানদের হিন্দুদের বিরুদ্ধে অপরাধ করতে সাহায্য করছে যাতে তাদের তাড়িয়ে দেওয়া যায় এবং তাদের জমি দখল করা যায়। তিনি দাবি করেন, দেশের জনগণের কাছে এই ষড়যন্ত্র যাতে প্রকাশ না পায় সেজন্য বিজেপি নেতাদের ওই এলাকার কাছেও যেতে দেওয়া হয়নি।

মোমিনপুরে ৯ অক্টোবর হিন্দু-বিরোধী সহিংসতা মোকাবিলায় পশ্চিমবঙ্গ পুলিশের দমনমূলক নীতি আবার প্রকট হয়েছে, সেখানে মুসলমানরা হিন্দু সমাজকে তাদের আক্রমণের লক্ষ্যবস্তু বানিয়ে বহাল তবিয়তে ঘুরছে। পশ্চিমবঙ্গের পুলিশ বিজেপি রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার এবং অন্য কয়েকজন বিজেপি নেতাকে দাঙ্গা-বিধ্বস্ত এলাকায় যাওয়ার সময় গ্রেপ্তার করার কয়েকদিন পরে মানব গুহ নামে এক কলকাতা-ভিত্তিক সাংবাদিককেও ১৪ অক্টোবর হেফাজতে নেওয়া হয়েছে, আজ তক রিপোর্ট করেছে। ফোটোসাংবাদিকের তথাকথিত 'অপরাধ' ছিল যে তিনি সোশ্যাল মিডিয়ায় হিন্দু বিরোধী সহিংসতার ফুটেজ এবং ছবি পোস্ট করার সাহস করেছিলেন।

এক কলাম লেখক প্রশ্ন তুলেছেন, পুলিশ সাংবাদিক মানব গুহকে গ্রেপ্তারের কারণ হিসাবে দেখিয়েছে দাঙ্গায় উসকানি। যদিও পরিষ্কার নয় সাংবাদিক মানব গুহ ঠিক কীভাবে মোমিনপুরের দাঙ্গায় উসকানি দিয়েছিলেন। সাংবাদিক মানব গুহর গ্রেপ্তার নিয়ে কোনো সংবাদ মাধ্যম একটাও খবর করেনি। কলকাতায় প্রেস ক্লাবও কিছু বলেনি। সাংবাদিক মানব গুহ বোমা মারেননি, কোনো লোকও জড়ো করেননি। সেখানে কোনোও উসকানিমূলক বক্তব্যও রাখেননি। তিনি শুধুমাত্র নিজের সাংবাদিক সত্তার প্রতি সৎ থেকে ঘটনা তুলে ধরেছিলেন। এবার কলকাতা পুলিশ কী বলতে চায় যে মানব গুহ যে সমস্ত ভিডিয়ো তার প্রতিবেদনে দেখিয়েছিলেন সেগুলি ভুয়ো? যদি তা না হয় তাহলে বলুন তার কী অপরাধ? ৪৮ ঘণ্টা ধরে ঠুঁটো জগন্নাথ হয়ে বসে থাকা পুলিশ নিজে নিজের বিরুদ্ধে কী ব্যবস্থা নিয়েছে? কোনও বিভাগীয় তদন্ত হয়েছে? কোনও শাস্তির সুপারিশ করা হয়েছে? আর জুবেরের মতো 'সাংবাদিকের' জন্য যাদের মাথা ফাটে, জুবের দিনের পর দিন হিন্দুধর্ম নিয়ে নোংরামি করার পরেও তারা আজ কোথায়? এটা কি বাকস্বাধীনতার উপরে আক্রমণ নয়? এটা সাংবাদিকের কণ্ঠরোধ নয়? পুলিশ এবং এই রাজ্যের 'লোকাল গার্জেন' সিরিয়াল বুদ্ধিজীবী কাউকেই এখন খুঁজে পাওয়া যাবে না। কারণ যেহেতু সাংবাদিক মানব গুহ হিন্দুদের উপরে হওয়া অত্যাচারের কথা তুলে ধরেছেন।

এদিকে ১২ অক্টোবর কলকাতা হাইকোর্ট পশ্চিমবঙ্গের ডিজিপিকে মোমিনপুর সহিংসতার তদন্তের জন্য একটি এসআইটি গঠন করে রিপোর্ট জমা দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছে। আর কোনো সহিংসতা যাতে না হয় তা নিশ্চিত করতেও পুলিশকে বলেছে আদালত। হাইকোর্ট স্পষ্ট করে বলেছে যে এলাকায় কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েনের এখন প্রয়োজন নেই। এই আদেশে সিসিটিভি-সহ পুলিশ পিকেট স্থাপন করতে চেয়েছিল। বিচারপতি জয়মাল্য বাগচি এবং বিচারপতি অপূর্ব সিনহার রায়ের সমন্বয়ে গঠিত একটি অবকাশকালীন বেঞ্চ বলেছেন, সিটকে দুর্বৃত্তদের চিহ্নিত করতে এবং জনগণের উপর আস্থা ফিরিয়ে আনার দায়িত্ব দেওয়া উচিত। এই রায়ে বলা হয়েছে এসআইটি 'একটি কার্যকর এবং দক্ষ পদ্ধতিতে তদন্ত পরিচালনা করবে এবং ঘটনার ভিডিও ফুটেজ সহ ইলেকট্রনিক প্রমাণ সংরক্ষণ ও বিশ্লেষণের জন্য প্রয়োজনীয় সমস্ত পদক্ষেপ নেবে। তারা দায়ী দুর্বৃত্তদের গ্রেপ্তারের জন্য দ্রুত ব্যবস্থা নেবে।' আদালত রাজ্য সরকারকে ক্ষতিগ্রস্তদের ক্ষতিপূরণ দিতে, সহিংসতার কারণে বাস্তুচ্যুত ব্যক্তিদের প্রত্যাবাসন করতে এবং ছুটির পর দুই সপ্তাহের মধ্যে আদালতে প্রতিবেদন জমা দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছে।

রাজ্য সরকার আদালতকে জানিয়েছিল যে তারা ইতিমধ্যে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের কাছে একটি প্রতিবেদন পাঠিয়েছে। আদালত পর্যবেক্ষণ করেছে যে কেন্দ্র এই ইস্যুতে তদন্তের ভবিষ্যতের পথ নির্ধারণ করতে পারে। কলকাতা হাইকোর্ট মোমিনপুর সহিংসতার সিট তদন্তের নির্দেশ দিয়েছে, কিন্তু এন আই এ আইন, ২০০৮ মেনে রাজ্য কেন্দ্রের কাছে একটি প্রতিবেদন জমা দিয়েছে। এন আই এ তদন্তের প্রয়োজন হলে কেন্দ্র দুই সপ্তাহের মধ্যে সিদ্ধান্ত নিতে পারে, আদালত পর্যবেক্ষণ করেছে। এদিকে কলকাতার পুলিশ কমিশনার বিনীত গোয়েল বলেছেন, ''আমরা স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়ে এনেছি। আমরা ৪৫ জনকে গ্রেপ্তার করেছি এবং আতঙ্কিত হওয়ার কিছু নেই।

তথ্যভিজ্ঞ মহল থেকে প্রশ্ন উঠেছে—

১। ৭৫ নম্বর ওয়ার্ডের (ওয়াটগঞ্জ এলাকা) শাহবাজ আলম তার আগের দিন ওইখানে উসকানিমূলক বক্তৃতা দিয়েছিল কেন? ২। ওইদিন তিলজলা, রাজাবাজার প্রভৃতি এলাকা থেকে শ'য়ে শ'য়ে মুসলমান জড়ো হলো কীভাবে? ৩। ৮ অক্টোবর দাপুটে তৃণমূল নেতা ও মুখ্যমন্ত্রীর অতি বিশ্বাসভাজন ববি হাকিম ওই এলাকায় কী করতে গিয়েছিলেন? □

মোদীনোমিক্সের জাদুতে দৌড়চ্ছে ভারতের অর্থনীতি

সুদীপ্ত গুহ

আমাদের প্রধানমন্ত্রী কোনো অর্থনীতিবিদ নন। সঙ্ঘের স্বয়ংসেবক হিসেবে কয়েক দশক মানুষের সেবা করে চিনেছেন মানুষ, চিনেছেন সমাজ, সমাজের প্রান্তিক মানুষের শক্তি ও সীমাবদ্ধতা অনুভব করেছেন। সেবার মাধ্যমেই শিখেছেন মানুষকে দারিদ্র্য থেকে মুক্তি দেবার বিভিন্ন রাস্তা। যখন তাত্ত্বিক অর্থনীতি। তার সঙ্গে সবচেয়ে কম অভ্যন্তরীণ মুদ্রাস্ফীতিও আমাদের দেশেই। চরম সংকটকালে অর্থনীতি নিয়ে এই নিরীক্ষা আগামীদিনে নিশ্চয়ই অর্থনীতির গবেষণার একটা নতুন দিক খুলে দেবে, যেখানে বিশ্বের কোনো একটি দেশ প্রথমবার চোখে আঙুল দিয়ে কেনসিয়ান অর্থনীতি তত্ত্বের সীমাবদ্ধতা দেখিয়ে দিল।

অর্থনীতিবিদরা অতিমারী থেকে বেরিয়ে আসার জন্য টাকা ছাপিয়ে মানুষের হাতে তুলে দিতে বলেছেন এবং সেই উপদেশ পৃথিবীর উন্নত ও অনুন্নত সব দেশের রাষ্ট্রনায়ক শুনেছেন, তখন তিনি একমাত্র রাষ্ট্রনায়ক যিনি তা উপেক্ষা করার সাহস দেখাতে পেরেছেন। আর তার ফলেই, অতিমারী-উত্তর পৃথিবীতে ভারত বিশ্বের ২০টি উন্নত দেশগুলির মধ্যেই সবচেয়ে বেশি বৃদ্ধির হার (জিডিপি বৃদ্ধি) নিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে এবং বিশ্বব্যাংকের মতে, আগামী এক দশক এভাবেই চলবে পৃথিবীর

এই লেখার উদ্দেশ্য কিন্তু রাজনৈতিক নয়। কোনো দল বা সরকারকে সমর্থন করার জন্য নয়। দেশ কোন দিকে যাচ্ছে, সেটা একটু সহজ ভাষায় আলোচনা করাই এই লেখার উদ্দেশ্য। বর্তমানে দেশ কোন দিকে এগোচ্ছে, সেটা যদি দেশবাসী বা দেশের কোনো একটি অঙ্গরাজ্যের অধিবাসী না জানে, তবে সেই ভূখণ্ডের সাধারণ মানুষ কীভাবে সিদ্ধান্ত নেবে তাঁর জীবন, জীবিকা, বিনিয়োগ কিংবা ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা সম্পর্কে? অথচ আমাদের রাজ্যের সংবাদমাধ্যম, শিক্ষক ও অধ্যাপক সমাজ, বুদ্ধিজীবী এবং চলচ্চিত্র পরিচালকরা হাতে হাত মিলিয়ে মানুষকে ভুল বুঝিয়ে এসেছে গত সাত দশক। আর, আমরা পিছিয়েই গেছি। কবে শেষ হবে এই অধোগতি?

কিন্তু কেন সাত দশক বললাম? স্তালিন বেঁচে থাকাকালীন ভারত- সোভিয়েতের সম্পর্ক ভালো ছিল না, কারণ স্তালিন সম্ভবত গান্ধী ও নেহরুদের বিশ্বাস করতেন না। কিন্তু স্তালিনের মৃত্যুর পরেই ভারত ধীরে ধীরে সোভিয়েতের দিকে যাওয়া শুরু করে। সোভিয়েত রাশিয়া কোনো শত্রু বা বন্ধু দেশকে দখল করার জন্য অস্ত্র ব্যবহার করতো না। ওরা সমাজের মানুষের ব্রেনওয়াশ করার রাস্তা নিত। ভারতে ওরা দেখে কলকাতায় তৈরি জমি আছে। কলকাতার কমিউনিস্ট পার্টি-সহ কিছু ধর্মীয় ও উপধর্মীয় সংগঠন ভাবতে ভালোবাসে যে ভারতীয় হিন্দু সংস্কৃতির সবই খারাপ। পঞ্চাশের দশকের

মাঝামাঝি ব্রিগেডে নেহরুর সঙ্গে ক্রুশ্চেভ, বুলগানিনের মিটিং থেকে যাত্রা শুরু। এরপরে শুরু হলো সাবভার্সন অর্থাৎ মস্তিষ্ক প্রক্ষালন।

প্রথম উদাহরণ, ইন্দিরা গান্ধীর জাতীয়করণ নীতি। কলকাতার বিভিন্ন সংবাদপত্র এই নীতিরই মহিমা প্রচার করা এক প্রকার নিজের কর্তব্য বলে ধরে নিয়েছিল। কিন্তু জাতীয়করণের মোড়কে প্রশাসনিক অপদার্থতা এবং রাজনৈতিক দুর্নীতির পাহাড় কীভাবে সেই সময়ের ব্যাংকিং ব্যবস্থা ও শিল্পকে সর্বনাশের সম্মুখীন করেছে, সেই ব্যাপারে সম্পূর্ণ নীরব থেকেছে পশ্চিমবঙ্গের সংবাদমাধ্যম, যা বাঙ্গালির চরম ক্ষতি করে গেছে। সেই সময় বেশ কিছু ব্যাংক ও বিমা ব্যবসার মালিক ছিল কিছু বাঙ্গালি, যা আজকের বাঙ্গালি বিশ্বাসই করবে না। রাতারাতি ব্যাংক ও বিমা ব্যবসা থেকে হাত ধুয়ে ফেলে বাঙ্গালি। চা-বাগান থেকে চটকল বিদেশি বিনিয়োগকারীরা বেচে দিয়ে চলে যায় কিছু অসৎ এবং ইন্দিরা গান্ধীর প্রিয় ব্যবসায়ীর হাতে।

কিছুদিনের মধ্যে শিল্প ও কৃষিতে ধস নামে রাজ্যে। শুরু হয় নকশাল আন্দোলন। রাজ্য ছাড়ে মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীরা। কিন্তু রোগের কারণ অধরাই থেকে যায় পরের আড়াই দশক পর্যন্ত। বুদ্ধিজীবী, সংবাদমাধ্যম, শিক্ষক সংগঠন আমাদের সমাজকে নিয়ে যায় আরও বাম দিকে। বাড়তে থাকে আমাদের দুর্দশা। তৎকালীন শংকর, রমাপদ চৌধুরী কিংবা বাণী বসুর উপন্যাস আমাদের সেই চরম সংকটের সাক্ষ্য দেয়। সংবাদমাধ্যম বা বুদ্ধিজীবীরা যদি আমাদের সঠিক পথে চালাতো, তবে মুম্বাইয়ের মতো আমারাও জায়গা ঠিক রাখতে পারতাম। ইন্দিরা গান্ধীর ভুল নীতি কলকাতাকে ডোবাতে পারলেও মুম্বাইকে পারেনি। কারণ ওরা নেতিবাচক চিন্তাকে বাড়তে দেয়নি। একটা উদাহরণ নেয়া যাক চলচ্চিত্র থেকে। মৃণাল সেনের 'আকাশ কুসুম' ছবিতে বড়লোক নায়িকার সঙ্গে গরিব নায়কের ইতিবাচক পরিণতি না দেখিয়ে মৃণালবাবু সমাজকে বোঝাতে চেয়েছেন যে, আমাদের সমাজ ব্যবস্থা এমন এক ব্যবস্থা যেখানে গরিবের সঙ্গে বড়লোক এক সঙ্গে চলতে পারে না। অথচ এই ছবিরই হিন্দি রিমেক 'মঞ্জিল' কিন্তু ইতিবাচক পরিণতি দেখিয়েছে। কারণ প্রযোজক জানেন, বম্বের দর্শক কিছুতেই নেতিবাচক চিন্তার ছায়াছবিকে নেবে না। আর এই কারণেই, ওরা আজ দেশের আর্থিক ও বাণিজ্যিক রাজধানী আর আমরা নেতিবাচক চিন্তাভাবনার কেন্দ্র। দেশের বৃহত্তম বৃদ্ধাশ্রম।

এবার উদাহরণ দেব ইতিহাসের আরেক সন্ধিক্ষণ থেকে। ১৯৯১-তে পিভি নরসিমা রাও ক্ষমতায় এসে দেশের অর্থনীতি, বিদেশনীতি, শিক্ষানীতি, বাণিজ্যনীতি ও প্রশাসনে আমূল পরিবর্তন আনেন। এই সংস্কার নেহরু, ইন্দিরা ও রাজীবের নীতির সম্পূর্ণ বিপরীত ছিল। যথারীতি, এইবারও পশ্চিমবঙ্গের প্রতিটি সংবাদপত্র রাওয়ের বিরোধিতা করল। বিরোধিতা করেন তৎকালীন পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অর্থমন্ত্রী তথা এমআইটি ফেরত অর্থনীতিবিদ ড. অসীম দাশগুপ্ত। ফলও হাতেনাতে। যখন হায়দরাবাদ, ব্যাঙ্গালোর, পুনে, গুরগাঁওতে মাইক্রোসফট, আইবিএম, ইনটেল, সিসকো থেকে টিসিএস, ইনফোসিস আসছে, বাঙ্গলায় তখন বেঙ্গল অম্বুজা, বেঙ্গল সৃষ্টি, রোজভ্যালি, এমপিএস, সারদা ইত্যাদি। যদিও ছিটেফোঁটা তথ্যপ্রযুক্তি কোম্পানিও এসেছিল। অন্ধ্রপ্রদেশের ছেলে-মেয়েরা যখন সফটওয়্যার শিখে বিদেশ পাড়ি দিচ্ছে, বিহারের ছেলে-মেয়েরা যখন আইএএস পরীক্ষার প্রস্তুতি নিচ্ছে, আমাদের বামপন্থী মাস্টারমশাইরা ছাত্র-ছাত্রীদের বোঝাচ্ছেন, 'দ্যাশের অবস্থা খুব খারাপ। আমাদের নিমপাতা, বাসমতি চাল ব্যাবাক নিয়া যাইবো আমেরিকা' ইত্যাদি। সারা দেশ যখন ইতিবাচক, তখন একমাত্র আমাদের রাজ্য নেতিবাচক চিন্তায় মগ্ন। এর প্রভাব শিক্ষার বিষয়ের নির্বাচনে তথা ক্যারিয়ার নির্বাচনে কীভাবে পড়েছিল তাঁর একটা উদাহরণ দিই।

নব্বইয়ের দশকে যখন আইআইটি এবং অন্যান্য রাজ্যের জয়েন্ট এন্ট্রান্সের কাউন্সিলিঙে কম্পিউটার, ইলেকট্রনিক্স, ইলেকট্রিক্যাল, ইন্সট্রুমেন্টেশন প্রথম চারটি পছন্দ, আমাদের রাজ্যে ইলেকট্রনিক্স, কম্পিউটার, মেকানিক্যাল এবং তারপর ইলেকট্রিক্যাল। দিল্লি, মুম্বাইয়ে যখন ছাত্র-ছাত্রী অর্থনীতি, বাণিজ্য, পরিবেশ কিংবা সমাজবিজ্ঞান নিয়ে পড়াশোনার দিকে

দৌড়াচ্ছে, কলকাতা তখনও পদার্থবিদ্যা বা রসায়নবিদ্যার বাইরে ভাবতে পারছে না। ১৯৯৫-তে বিভিন্ন ইঞ্জিনিয়ারিং ও ম্যানেজমেন্ট ইনস্টিটিউটে যখন টিসিএস ঝেঁটিয়ে লোক নিল প্রথমবার, তখনও আমাদের শিক্ষকরা বুঝতে পারছিলেন না সফটওয়্যার তথা তথ্যপ্রযুক্তির চাকরিতে ছাত্রদের যাওয়া ঠিক হবে নাকি ভুল। এ যেন সেই তাপগতিবিদ্যা তথা Thermodynamic-এর অ্যাডায়াবেটিক কন্ডিশন। বাইরের কোনো শক্তি (এখানে তথ্য) এই রাজ্যে আসে না, ভিতরের কোনো শক্তি সিস্টেমের বাইরে যায় না।

এই প্রসঙ্গে ১৯৮৬-এর জাতীয় শিক্ষানীতি এবং ১৯৯২-এর সংশোধন বাদ দিলে ভূমিকাটা পূর্ণ হবে না। ১৯৮৬-তে তৎকালীন শিক্ষামন্ত্রী পিভি নরসিমা রাও জাতীয় শিক্ষানীতি ঘোষণা করেন। পরে প্রধানমন্ত্রী হয়ে দেশের নতুন অর্থনীতি, বিদেশনীতি, প্রতিরক্ষানীতি এবং শিল্প ও বাণিজ্য নীতির সঙ্গে তাল মিলিয়ে সেটার কিছু পরিবর্তন আনেন। সব রাজ্য মেনে নিলেও বিরোধিতা করে আমাদের রাজ্যের সিপিএম সরকার। সংবাদমাধ্যম ও বুদ্ধিজীবীর দল এই হঠকারী কাজের সমর্থন করে সমাজকে ভুল পথে চালিত করে। আজ পশ্চিমবঙ্গের

অধিকাংশ সিনিয়র আইএএস, আইপিএস বিহার বা উত্তরপ্রদেশের। সফটওয়্যার ইন্ডাস্ট্রিতে রাজত্ব দক্ষিণ ভারতের। সেইদিন যদি অসীম দাশগুপ্ত, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় (যার পুত্র এখন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অধিবাসী) থেকে আনন্দবাজার পত্রিকা মানুষকে মিথ্যা না বোঝাতেন, বাঙ্গলা ও বাঙ্গালির আজ এই দুরবস্থা হতো না, যেখানে কম্পিউটার ইঞ্জিনিয়ার থেকে চাষি সবাই রাজ্য ছাড়ছে সুযোগের অভাবে। এই ২০২২-এ কলকাতার সেরা কলেজগুলিতে অনার্সের আসন খালি থাকার অন্যতম কারণ আমাদের সমাজের সংবাদপত্র, রাজ্যের শাসক দল এবং তথাকথিত বুদ্ধিজীবীরা আমাদের যুবক-যুবতীদের ভুল পথে চালিত করছে। যখন আমাদের দেশ পৃথিবীর পাঁচটি বৃহত্তম অর্থনীতির একটি এবং মুদ্রাস্ফীতি সবচেয়ে কম, তখন আমাদের দু'বছর আগে অতিমারীর সময়ের কমে যাওয়া জিডিপির গল্প বারবার শুনিয়ে বোঝানোর চেষ্টা চলছে যে দেশের অবস্থা খুব খারাপ। যার ফল শিক্ষার প্রতি এই অনাসক্তি। চাকরির পরীক্ষায় দুর্নীতি যদিও একটা বড়ো ভূমিকা পালন করছে।

এবার আসি গত আট বছরে আমরা কোথায় পৌঁছেছি এবং কীভাবে এলাম, সেই বিশ্লেষণে। ২০১৪-তে মোদীজী যখন ক্ষমতায় এলেন তখন দেখলেন, মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার থেকে উকিল এমনকী কলা বিভাগের ছাত্র-ছাত্রী, সবাই দৌড়াচ্ছে তথ্য প্রযুক্তি শিল্পে কাজের জন্য। চাষিরা গ্রামের মাটি ছেড়ে যাচ্ছেন বড়ো শহরে মেট্রো রেলের নির্মাণে অংশ নিতে। বাবা মা আধপেটা খেয়ে ছেলে-মেয়েদের ইংরেজি মাধ্যম স্কুলে পাঠাচ্ছে এই ভেবে যে, অঙ্ক না শিখলেও ক্ষতি নেই, কিন্তু ইংরেজি জানতে হবে। যাতে সফটওয়্যার তথা তথ্য প্রযুক্তি শিল্পের একটা অফিসে আমার সন্তান বসতে পারে। কারণ, দেশের ৫৬ শতাংশ জিডিপি আসছে পরিষেবা থেকে। অন্যদিকে উৎপাদন শিল্প ও কৃষিতে চলছে এক মাৎস্যন্যায়। এটা ঠিক যে ১৯৯১-এর পর আমাদের দেশ নাটকীয়ভাবে নিজেকে পরিবর্তন করেছে। তরাইনের দ্বিতীয় যুদ্ধে পৃথ্বীরাজ চৌহানের পরাজয়ের আটশো বছর পর ভারত নিজের দর্শন, অর্থনীতি ও মানবসম্পদকে সম্পূর্ণ ভারতীয় মতে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে। পরের তেরো বছর ভারতীয় অর্থনীতি, বিদেশনীতি, বাণিজ্যর সুবর্ণযুগ। ২০০৪ থেকে ২০১৪ আমাদের দেশ একজন উচ্চশিক্ষিত প্রধানমন্ত্রী পেলেও তিনি ছিলেন একজন বন্দি রাজা। অটলজীর সংস্কারের ফল কিছুদিন ভোগ করলেও যাওয়ার সময় রেখে গেছে এক দিশাহীন সমাজ।

এই অবস্থায় মোদীজী এসে লক্ষ্য করলেন : (১) শক্তি ক্ষেত্রে আমরা মধ্যপ্রাচ্যের উপর নির্ভরশীল। (২) ভোজ্য তেলের জন্য আমরা নির্ভরশীল লাতিন আমেরিকা, পূর্ব এশিয়া এবং রাশিয়া-ইউক্রেনের উপর । (৩) ইলেকট্রিক দ্রব্যের জন্য চীন। (৪) মাইক্রোচিপের জন্য তাইওয়ান-চীন। (৫) এলইডি বাতির জন্য চীন। (৬) ওষুধের পেটেন্টের জন্য আমেরিকা এবং উপাদানের জন্য চীন। (৭) ইউরেনিয়ামের জন্য রাশিয়া। বিভিন্ন খনিজের জন্য অস্ট্রেলিয়া, ইন্দোনেশিয়া ও লাতিন আমেরিকা। (৮) যাওয়ার আগে এমন জমিনীতি বানিয়ে গেছেন ড. মনমোহন সিংহ, যে আমাদের ব্যবসায়ীরা চীন বা বিভিন্ন আফ্রিকার দেশে বিনিয়োগ শ্রেয় মনে করছে। (৯) প্রণববাবুর করে যাওয়া Retrospective taxation আইন বিদেশি বিনিয়োগকারীদের কাছে দেশ সম্পর্কের ভীতির সঞ্চার করে গেছে। (১০) শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের গবেষণার সঙ্গে বাস্তবের কোনো যোগ নেই। (১১) দেশের ৪০ শতাংশ মানুষ ব্যাংকিং সিস্টেম ও সামাজিক সুরক্ষার বাইরে। ছোটো কৃষক থেকে ছোটো ব্যবসায়ী অর্থের জন্য সেই মহাজনের কাছেই যায়। যেন সেই 'দুই বিঘা জমি'র পৃথিবী। (১২) ইন্টারনেট পেমেন্ট ব্যবস্থা চালু হয়েছে, কিন্তু দেশের মানুষকে বহুটাকা কমিশন গুনতে হচ্ছে ভিসা কার্ড, মাস্টার কার্ড বা SWIFT নেটওয়ার্কিং কোম্পানিকে।

এককথায়, প্রতিরক্ষা সরঞ্জাম, বিমান সরঞ্জাম, গাড়ি, ব্যাটারির জন্য প্রয়োজনীয় রাসায়নিক দ্রব্য, ওষুধ, দুরভাষ যন্ত্র, খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ, সৌরশক্তির জন্য প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম, ইস্পাত, সিমেন্ট, সার থেকে বেনারসি শাড়ি, পুতুল আমরা হয় তৈরি করতাম না, নয় দাম এতো বেশি ছিল যে দেশবাসীই সেটা কিনতো না। না ছিল আধুনিক প্রযুক্তি, না ছিল গবেষণার পরিবেশ। ব্যাপারটা অনেকটাই 'বিদ্যে বোঝাই বাবুমশাই' গোছের। পড়াশোনা করেছি, কিন্তু বাড়িতে কাজের লোক এলে বৃষ্টির দিনে আদা চা করে দেবারও মুরোদ নেই। মাইনের সব টাকা কাজের লোক, ড্রাইভার থেকে ইলেকট্রিসিয়ানের জন্য খরচ হয়ে যায়। ভারতও পরিষেবা ক্ষেত্রে (তথ্য প্রযুক্তি, সফটওয়্যার ইত্যাদি) যা আয় করতো,

তাঁর একটা বড়ো অংশ চলে যেত বিদেশ থেকে পণ্য এবং পরিষেবা কিনতে। আমাদের বস্ত্র বাজারেও রাজত্ব করতো বাংলাদেশিরা। আমাদের দেশের রিলায়েন্স কোম্পানি যশোর খুলনায় কাপড় বানিয়ে বেচতো কলকাতা থেকে ক্যালিফোর্নিয়ার বাজারে।

কিন্তু কেন পারতাম না? পারা কি আদৌ সম্ভব? না সম্ভব না? ওই উপরোক্ত বাবুমশাই স্নাতকের পক্ষে যেমন নিজের সব কাজ করা সম্ভব না, তেমনই। কিন্তু পরনির্ভরতা তো কমাতে হবে? নইলে কাল যদি চীন ওষুধের উপাদান পাঠানো বন্ধ করে, কিংবা মধ্যপ্রাচ্য তেল, কিংবা ইন্দোনেশিয়া ভোজ্য তেল, কোথায় যাব আমরা? হঠাৎ যুদ্ধ লাগলো, আর চীনের কথা শুনে রাশিয়া সাহায্য বন্ধ করে দিল। কী করবো আমরা? আর ঠিক এই কারণেই কিন্তু ভূ-রাজনীতিতে আমরা পিছিয়ে ছিলাম। আমাদের দেশে কেউ বোমা মেরে গেলে, আমরা মৌখিক প্রতিবাদটুকু করতাম অনেক চিন্তা করে। আর এখানেই মোদীজী আত্মনির্ভর হবার স্বপ্ন দেখা শুরু করেন?

কিন্তু আত্মনির্ভরতা ব্যাপারটা কি এতই সহজ? যদি হতো, বাকিরা পারলেন না কেন? এখনো কি আমরা মোটামুটি আত্মনির্ভর? সমস্যা কোথায় ছিল? আসলে ভারত একটা দশ অশ্বশক্তির যন্ত্র, যা চলছিল দুই অশ্বশক্তিতে। বস্তাপচা ব্রিটিশ যুগ/সোভিয়েত যুগের আইন, জটিলতর ব্যবস্থা, কোম্পানি আইনের অসম্পূর্ণতা এর জন্য দায়ী। আর কৃষকদের অবস্থা তো জালনিবদ্ধ রোহিতের মতো। একজন যুবক একমাত্র সরকার নির্ধারিত ফড়েদেরই কিংবা সরকারি গুদামেই তাঁর শস্য বেচতে পারতো। কীভাবে এই দুই অশ্বশক্তিতে চলা যন্ত্রকে তিনি নিজের শক্তিতে চলার জায়গায় আনলেন?

(১) দেশের সব মানুষকে জনধন ব্যাংক অ্যাকাউন্ট খুলিয়ে দিলেন। (২) দেশের দরিদ্রতম মানুষকে প্রথমবার হাতে ধরালেন জীবন বিমা, দুর্ঘটনা বিমা এবং চিকিৎসা বিমার পলিসি। (৩) প্রতিটি অ্যাকাউন্ট হোল্ডার পেলেন একটি করে রুপে কার্ড, যা বিশ্বব্যাপী রাজত্ব করা ভিসা এবং মাস্টার কার্ডের ঘাড়ে নিঃশ্বাস ফেললো। (৪) আন্তর্জাতিক অনলাইন লেন-দেনের মাধ্যম তথা SWIFT-এর বিকল্প হিসেবে আরও সহজে ব্যবহারযোগ্য ইউপিআই নামক ইলেকট্রনিক্স মাধ্যম চালু করলেন। (৫) দেশের সব নাগরিককে বললেন, নিজের আয় ঘোষণা করে কর দিয়ে দিতে। নইলে আগামীদিনে আরও কঠিন পদক্ষেপ নিতে হবে সরকারকে। (৬) এরপর নোটবন্দি ঘোষণা করলেন। দেশের সব ৫০০ ও ১০০০ টাকার নোট বাতিল করলেন। (৭) কিছুদিনের মধ্যে দেশের দেড় ডজন অপ্রত্যক্ষ করের বদলে আনলেন একটা মাত্র কর। তথা জিএসটি অর্থাৎ পণ্য ও পরিষেবা কর। (৮) আমাদের দেশে ১৯৬৯-এ ব্যাংক জাতীয়করণ হলেও, ব্যাংকের হাতে তাঁর নিজের টাকা আদায়ের ক্ষমতা দেননি ইন্দিরা গান্ধী। দেশের এক দল বড়ো ব্যবসায়ী এই সুযোগে কোটি কোটি টাকা লুট করতো এবং সরকার টাকা ছাপিয়ে ব্যাংককে বাঁচাতেন। আমানতকারীর সরাসরি ক্ষতি নাহলেও মুদ্রাস্ফীতিতে মানুষের প্রকৃত আয় কমে যেত। ২০০২-এ অটলজী সরফসি আইন প্রণয়ন করে ব্যাংককে টাকা আদায়ের আইনি ক্ষমতা দিলেন। কিন্তু ২০০৪ থেকে ২০১৪, সেই আইনও বলবৎ হয়নি। তাছাড়া কোম্পানি বন্ধ করার কোনো আইন ছিল না। মোদীজী ২০১৬-তেই আনলেন ইনসলভন্সি অ্যান্ড ব্যাংকরাপসি কোড। এই কোড ব্যাংককে ক্ষমতায়ন করে দেউলিয়া ঘোষণা করে ওই কোম্পানি বিক্রি করে নিজের টাকা উদ্ধারে। গত আট বছরে এটা অন্যতম বড়ো সংস্কার। (৯) আবাসন ক্ষেত্রে ক্রেতাকে সঠিক অধিকার দিতে আনা হলো, RERA। (১০) এরপর আনা হলো তিনটি কৃষি বিল, যা কৃষি বিপণনে বিপ্লব আনতে পারতো। কিন্তু আড়াইটি রাজ্যের প্রতিবাদে পিছিয়ে আসতে হয় কেন্দ্রকে। তবে এই বিল দেশের কৃষকদের জন্য নতুন সুযোগ এনে দেবে এবং সরকার আলোচনার মাধ্যমে ভবিষ্যতে আবার এই বিল আনবে। (১১) দুশো শ্রমিক আইনের বদলে আনলেন চারটি লেবার কোড। শ্রমিকদের মাইনে অনলাইন করা আগেই বাধ্যতামূলক করেছিলেন। (১২) তারপর মুদ্রা যোজনা আনলেন। আরও কিছু সংস্কার আগামী দিনে আসতে চলেছে। ব্যাংকিং, পুলিশ এবং বিচার ব্যবস্থায় বড়ো সংস্কার আগামী দিনে আসছে। কারণ দেশের পুলিশ ও বিচার ব্যবস্থা সঠিক না হলে কেউ দেশে বিনিয়োগ করবে না।

মূল সংস্কার ছাড়াও, বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিভিন্ন আলাদা নীতি তৈরি করেছে ভারত সরকার। যেমন, মাইক্রোচিপ, উৎপাদন ক্ষেত্র, সবুজ হাইড্রোজেন, ইলেকট্রিক ব্যাটারি, ইলেকট্রিক গাড়ি, সার, ওষুধ, আন্তর্জাতিক খনিজ সম্পদের মালিকানা, পরিকাঠামো, ভোজ্য তেল, শিক্ষা ও বিজ্ঞান-প্রযুক্তি গবেষণা বিশেষত প্রতিরক্ষা/চিকিৎসা ক্ষেত্র ও কৃত্রিম মেধা এই প্রত্যেক ক্ষেত্রে সরকার আলাদা নীতি বানিয়েছে।

এতগুলো সংস্কার যজ্ঞের ফল ২০২১-২২ অর্থবর্ষে আমরা দেখতে পাই। তার কিছু উল্লেখ করা হলো— (১) জিডিপি বৃদ্ধির হার উন্নত দেশগুলোর চেয়ে বেশি এবং ভারত ব্রিটেনকে ছাড়িয়ে বিশ্বের পঞ্চম স্থানে, (২) পণ্য রপ্তানিতে ভারত এই বছর রেকর্ড করে যা $৪০০ বিলিয়ন, (৩) ফরেন রিজার্ভ সর্বকালীন রেকর্ড উচ্চতায় $৬০০ বিলিয়ন, (৪) দেশের সবকটি ব্যাংক প্রথমবার ছাড়িয়েছে ১ লক্ষ কোটি টাকা, (৫) সড়কপথ এই আট বছরে হয়েছে দ্বিগুণ, (৬) বিমান নেটওয়ার্ক ৩ গুণ, (৭) ব্যাংক অ্যাকাউন্ট বেড়েছে ৩ গুণ, (৮) ইন্টারনেট ডাটা পরিষেবা বেড়েছে ৫৪ গুণ এবং (৯) প্রত্যক্ষ বিদেশি বিনিয়োগ বেড়েছে আড়াই গুণ।

উপরোক্ত প্রতিটি বিষয় নিয়ে স্বতন্ত্র নিবন্ধ লেখা যায় এবং পুরো ব্যাপারটা লিপিবদ্ধ করতে প্রয়োজন একটা বই। কিন্তু প্রবন্ধের শব্দ সীমাবদ্ধতার জন্য এখানেই শেষ করছি। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, অতিমারীর সংকটে চিরাচরিত মুদ্রা বাজারে ছাড়ার অর্থনীতি ত্যাগ করে স্বাধীন আর্থিক চিন্তার যে ফসল, আজ আমাদের দেশকে আগামীদিনে বিশ্বের বৃহত্তম অর্থনীতির মধ্যেই সবচেয়ে বেশি আর্থিক বৃদ্ধি দেবার অঙ্গীকার করছে, তা আগামীদিনে ছাত্র-ছাত্রীদের গবেষণার বিষয় হবে। মোদীনোমিক্স নিয়ে কলম ধরার কারণ হলো, ইন্দিরা গান্ধী, অসীম দাশগুপ্তর ভুল নীতি কিংবা নরসিংহ রাও, অটলবিহারী বাজপেয়ীর সঠিক নীতিকে ভুল বুঝে বাঙ্গালি প্রজন্ম যে ভুল করেছিল, তার যাতে পুনরাবৃত্তি না হয়।

(লেখক বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ)

শিক্ষাক্ষেত্রে দুর্নীতি—একটি প্রাতিষ্ঠানিক অপরাধ

বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গের সবচেয়ে বড়ো দুর্নীতি হলো শিক্ষাক্ষেত্রে দুর্নীতি। বাম আমলে শিক্ষাদীক্ষায় পশ্চিমবঙ্গ যখন পিছিয়ে পড়ছিল, তখন মানুষ পরিবর্তনের সরকারের কাছে শিক্ষাক্ষেত্রে আমূল রদবদল আশা করেছিলেন। শিক্ষাব্যবস্থা ও পরিকাঠামো, সিলেবাস সবকিছুতেই ব্যাপক পরিবর্তন হবে এইরকম একটা ধারণা রাজ্যের মানুষের ছিল। প্রথমদিকে নতুনভাবে শিক্ষাকে ঢেলে সাজানোর কিছুটা চেষ্টা করেছিল বর্তমান সরকার।

কিন্তু কার্যক্ষেত্রে দেখা গেছে। শিক্ষক নিয়োগ থেকে শুরু করে পাঠক্রমের সিলেবাস,কোনোক্ষেত্রেই এনসিআরটি'র নিয়ম অনুসরণ করা হয়নি। ফলে শিক্ষক নিয়োগ পরীক্ষাগুলি যে পদ্ধতিতে হয়েছে তাতে দুর্নীতি করার সুযোগ থেকে গেছে। সেইসঙ্গে একের পর এক কোর্টে কেস ফাইল হয়েছে। যোগ্য মেধাকে বঞ্চিত করে অর্থের বিনিময়ে অযোগ্য প্রার্থীকে সুযোগ করে দেওয়া হয়েছে। প্রথমদিকে এই দুর্নীতির শিকড় কতদূর বিস্তৃত তা বোঝা যায়নি। কিন্তু বর্তমানে একের পর এক দুর্নীতি ফাঁস করছে ইডি ও সিবিআই। যতদিন যাচ্ছে তাতে পরিস্কার এটা একটা প্রাতিষ্ঠানিক সংঘটিত দুর্নীতি। সরকারি শিক্ষাব্যবস্থাকে পঙ্গু করে দেওয়া ও শিক্ষার বেসরকারিকরণের জন্য একঠা বড়ো চক্রান্ত।

হাইকোর্টের নির্দেশে শিক্ষাক্ষেত্রে এইসব দুর্নীতির তদন্ত চলছে। আশা করি এইসব দুর্নীতির শিকড় গোড়া থেকে উপড়ে ফেলা হবে। রাজ্যের প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী এই দুর্নীতির দায়ে জেলে আছেন। প্রাথমিক শিক্ষা সংসদের সভাপতি কয়েকদিন আগেই গ্রেপ্তার হয়েছেন। এই রাজ্যের মানুষ শিক্ষাক্ষেত্রে এইরকম লাগামছাড়া দুর্নীতি আগে কখনও দেখেনি। শিক্ষামন্ত্রী বা পর্ষদ সভাপতির একার দ্বারা এই এতবড়ো অপরাধ সংঘটিত হয়নি। এই অপরাধের সঙ্গে আরও অনেক সরকারি আধিকারিক, নেতা ও মন্ত্রী জড়িত আছেন। এদের প্রত্যেককে চিহ্নিত করে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দিলে ভবিষ্যতে পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষাব্যবস্থা বাঁচবে এবং গরিব মেধাবী যোগ্য প্রার্থীরা ন্যায় বিচার পাবে।

শিক্ষাক্ষেত্রে শুধু নিয়োগে দুর্নীতি নয়, শিক্ষক বদলিতেও দুর্নীতি হয়েছে। এমনকী সবুজসাথীর সাইকেল, ছাত্র-ছাত্রীদের নিম্নমানের পোশাক, মিড ডে মিলের মালপত্র সবকিছুতেই ব্যাপক দুর্নীতি হচ্ছে। এইসবেরও সঠিক তদন্ত হওয়া দরকার। শিক্ষা আনে চেতনা আর চেতনা আনে বিপ্লব। তাই বাঙ্গালির মধ্যে এমন শিক্ষা পরিবেশন হচ্ছে। যে শিক্ষা বাঙ্গালিকে আরও পিছনে ফেলে দিচ্ছে। তাই শিক্ষাক্ষেত্রে এই লাগামছাড়া দুর্নীতির আগে বিনাশ হোক। তারপর সরকার না হয় শিক্ষকদের টিউশন বন্ধ করতে কঠিন থেকে কঠোর হবে।

বেসরকারি কোচিং সেন্টারগুলোকে অবাধে ব্যবসা করতে সুযোগ দেওয়া, লাগামছাড়া দুর্নীতি ঢাকতে, বেকারদের তুষ্টি করতে শিক্ষা অধিকার আইনের ২৮ নং ধারা প্রয়োগ করছেন। অথচ ওই আইনের আর্টিকেল ২৭ নং এর চ্যাপ্টার ফোরে শিক্ষকদের শিক্ষা বহির্ভূত কোনো কাজে নিযুক্ত করা যাবে না। কিন্তু বাস্তবে শিক্ষকদের মিড ডে মিল, জামা, জুতো বিলোনো, সারা বছর ভোটার লিস্টে নাম তোলা, সংশোধন, বিয়োজন, বাড়ি বাড়ি সার্ভে সবকিছুই করানো হচ্ছে। আসলে শিক্ষা অধিকার আইন অনুযায়ী যেমন স্কুলগুলোতে পরিকাঠামো গড়ে ওঠেনি তেমনি শিক্ষক নিয়োগও হয়নি। তাই শিক্ষাক্ষেত্রে কার্যত এই সরকার সম্পূর্ণভাবে ব্যর্থ। একটা জাতিকে ধ্বংসের হাত থেকে বাঁচাতে শিক্ষাক্ষেত্রে দুর্নীতি বন্ধ হোক। শিক্ষা অধিকার আইন যথার্থভাবে চালু হোক।

—**চিত্তরঞ্জন মান্না,**
গড়বেতা, পশ্চিম মেদিনীপুর।

দুর্গাপূজাকে হেরিটেজ ঘোষণা ঐতিহাসিক

ভারতের স্বাধীনতা অর্জনের সময় দ্বিজাতিতত্ত্বের ভিত্তিতে মুসলমানদের জন্য ভারত ভেঙে পাকিস্তানের সৃষ্টি হয়। ফলশ্রুতি হিসেবে সেখানে অমুসলমানরা অত্যাচারিত হয়ে ভারতে প্রবেশ করে। সেই ঘটনা এখনোও ঘটে চলেছে। স্বাধীনতার সময় ২৯ শতাংশ অমুসলমানের সংখ্যা বর্তমানে বাংলাদেশে ৭.৯৫ শতাংশ, পশ্চিম পাকিস্তানে ৯ শতাংশ থেকে বর্তমানে ২ শতাংশে দাঁড়িয়েছে। পূর্ব পাকিস্তান মুক্তিযুদ্ধে ভারতের সর্বস্তরের সহযোগিতায় ধর্মনিরপেক্ষ বাংলাদেশের জন্ম হয়। কিন্তু মাত্র কয়েক বছর পরেই দেশে অবস্থানরত মুজিবুর পরিবারকে হত্যা করে 'ধর্মনিরপেক্ষ' শব্দটি মুছে দেশটির ধর্ম ইসলাম ঘোষণা করা হয়। ফলে অমুসলমানদের ওপর নির্যাতন পূর্বরূপ ধারণ করে। গত বছরও দুর্গাপূজায় ভাঙচুর, অগ্নিসংযোগ ও লুটপাট করা হয়। অন্যদিকে ভারতে ভারতীয় জনতা পার্টি ছাড়া অন্য রাজনৈতিক দলগুলির হিন্দুবিরোধী কার্যক্রম অব্যাহত। এমতাবস্থায় ইউনেস্কোর দুর্গাপূজাকে হেরিটেজ ঘোষণা এক ঐতিহাসিক ঘটনা। বিশ্বে হিন্দু বা সনাতন ধর্মের সম্মাননা এক যুগান্তকারী মর্যাদা প্রাপ্তি। আলোচনা প্রেক্ষিতে এই হিন্দুধর্মের দর্শন 'বসুধৈব কুটুম্বকম' অহিংস দর্শন। শাস্ত্রসম্মতভাবে অহিংস দর্শন। বেদের সার উপনিষদে বলা হয়েছে 'সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম'। আত্মাকে সমদৃষ্টিতে দর্শন করা হয়েছে। তবে কপিলদর্শনে ব্রহ্মকে দুটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে। স্থূল ও ও সূক্ষ্ম। স্থূল হলো সাকার। আর সূক্ষ্ম হলো নিরাকার প্রাণ। ব্যাস গীতায় বলা হয়েছে প্রাণ দেহ ধারণ না করলে কর্ম করার কোনও পন্থা সৃষ্টি হতো না। কর্ম সৃষ্টি না হলে জীবজগতের কোনো দৃশ্যমানতার কার্যকারণ থাকত না। কূর্ম পুরাণের ২২টি অধ্যায় ১৪১ শ্লোকে বর্ণিত। ঈশ্বরতত্ত্ব জানাই

পরম ধর্ম। ধর্মাশ্রিত কর্মই দেহ মনকে পবিত্র রাখে। তাই মূর্তিপূজা হিন্দু দর্শন। এই বিশ্বজনীন অহিংস দর্শন ও মূর্তিপূজা বিশ্বের বিভিন্ন দেশে এই হিন্দুরা হিংসায় ক্ষতবিক্ষত। ইউনেস্কোর এই দুর্গাপূজাকে হেরিটেজ ঘোষণা বিশ্বে অশান্তি দূরীকরণে বিশেষ সহায়তা গ্রহণ করবে এটাই প্রত্যাশা।

—রবীন্দ্রনাথ রায়,
রাশিডাঙ্গা, কোচবিহার।

সুপ্রিমকোর্ট এবং কলেজিয়াম

কলেজিয়াম প্রথার মাধ্যমে হাইকোর্টে এবং সুপ্রিমকোর্টের বিচারপতি নিয়োগ হয়। কলেজিয়াম কী? সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি-সহ সুপ্রিমকোর্টের শীর্ষ পাঁচ বিচারপতির কমিটি যাঁরা হাইকোর্ট এবং সুপ্রিমকোর্টের বিচারপতিদের নিয়োগের সুপারিশ করেন। বিচারপতিদের দ্বারা বিচারপতি নিয়োগ ভারত ছাড়া আর কোথাও নেই। বিচারপতিরা বিচারপতি নিয়োগের প্রশাসনে জড়িয়ে অনেকসময় সমালোচনার যোগ্য করে তোলেন। নিয়োগ প্রথায় ভুলত্রুটির দায় কলেজিয়ামকে নিতে হবে। স্মরণ করা যায় বিচারপতি ভাস্কর ভট্টাচার্য সুপ্রিম কোর্টে যেতে পারেননি কারণ তিনি কলেজিয়াম প্রথার সমালোচনা করে কলকাতা হাইকোর্টের এক বিচারপতিকে অযোগ্য বলেছিলেন। ২০১৪ সালে জাতীয় বিচার নিয়োগ কমিশন গড়লে সুপ্রিম কোর্টের কলেজিয়াম তা বাতিল করে দেয়। আইনসভা, প্রশাসনকে নিয়ন্ত্রণ করে বিচার বিভাগ, কিন্তু নিয়ন্ত্রণহীন বিচার বিভাগ হয়ে পড়ে। অনেক বিচারপতি বিচারে অতি সক্রিয়তা দেখাতে অনেক পর্যবেক্ষণ করেন কিন্তু আদেশে তার প্রতিফলন হয় না। আদেশ কার্যকরী করতে বিচারপতিদের কোনও অসুবিধা থাকে না। তবু কন্টেম অব কোর্ট শুনে সময় নষ্ট করেন। এই সমালোচনাহীন সংস্থাকে কে সমালোচনা করবে? বিচার বিভাগ সমালোচনার উর্ধ্বে নয়, বিতর্ক থেকেই যায়। আলোচনা কখনও সমালোচনা হয় না জানি। আলোচনা, সমালোচনা হলে ভালো সকলে তা জানে।

—সুবল সরদার,
মগরাহাট, দক্ষিণ ২৪ পরগনা।

ধনতেরাস ও বাঙ্গালি

১৭ অক্টোবর স্বস্তিকা পত্রিকায় প্রচ্ছদ নিবন্ধ বাঙ্গালির ধনতেরাস পড়ে খুব ভালো লাগল। ধনতেরাস উৎসবটি মা লক্ষ্মীর পুজো। সুখ ও সমৃদ্ধির উৎসব। বহুকাল আগে থেকে অবাঙ্গালিরা এই ধনতেরাস উৎসব পালন করেন। এখন বাঙ্গালিরাও এই সুখ ও সমৃদ্ধির উৎসবকে একটি বিশেষ অনুষ্ঠানরূপে কালীপুজোর রাত থেকে বেশ কটাদিন মেতে ওঠেন। মা লক্ষ্মীর কৃপা পাওয়ার জন্য এই সময় বিশেষ ধাতু অর্থাৎ সোনা বা রুপোর কোনও জিনিস কেনার জন্য বিবিন্ন জুয়েলারি দোকানে ভিড় করেন। সোনার কয়েন বা রুপোর লক্ষ্মী ও গণেশ মূর্তি কিনে এনে ঠাকুরের আসনে সারাবছর পুজো করা হয়। ধনতেরাস উৎসব এক ভাবাবেগের উৎসব। বাঙ্গালি ও অবাঙ্গালি সমাজ মনে করেন, এই সময় থেকে সুখ ও সমৃদ্ধির জন্য কোনও বিশেষ ধাতুকে সংগ্রহ করে সারা বছর নিজের কাছে রাখলে অর্থ, সুখ ও শান্তি থাকবে। সংসারে শ্রীবৃদ্ধি হবে। কোনও অভাব অনটন সংসারে প্রবেশ করতে পারবে না।

সনাতন হিন্দু ধর্মে সুখ ও সমৃদ্ধির জন্য কুবেরের পুজো করার রীতি আছে। এই কুবেরের পুজোকেই ধনতেরাস নামকরণ করা হয়েছে। এই পুজোর মূল উদ্দেশ্য অর্থ ও সম্পদ বৃদ্ধির পুজো। ধনতেরাস উৎসব কেন কালীপুজোর দিন থেকেই করা হয় তার একটা বিশেষ কারণ আছে। সাধারণত বিহার, উত্তরপ্রদেশ যেখানে অবাঙ্গালিরা বেশি থাকেন সেখানে দেওয়ালি বা দীপাবলি উৎসবরূপে পালন করা হয়। আলোর উৎসবকে সেইসব প্রদেশের লোকেরা শান্তি, সুখ ও সমৃদ্ধি বৃদ্ধির এক মঙ্গল সূচক হিসেবে দেখেন। এখন বাঙ্গালিরাও এই আলোর উৎসব দীপাবলি বা দেওয়ালির দিনটিকে মঙ্গলময় সুখ ও সমৃদ্ধির দিন হিসেবে পালন করছেন। ধন অর্থাৎ অর্থ আর তেরাস অর্থাৎ উৎসব। আলোর দিনে এই উৎসবে সবাকার মঙ্গল হোক যুগ যুগ ধরে আশা রেখে আসুন আমরাও সকল প্রদেশের মানুষ প্রতিবছর আনন্দে মেতে উঠি।

—সঞ্জয় ব্যানার্জী,
চুঁচুড়া, ব্যারাক রোড, হুগলী।

মোহমুক্তি দিবস পালন করা হোক

৮ অক্টোবর আমাদের ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে এসেছিলেন। এক রক্তাক্ত ভয়ংকর ইতিহাসের সাক্ষী হবার পর আজই তাঁর মোহমুক্তি ঘটেছিল। তিনি হলেন দলিত-মুসলিম ঐক্যের কল্পনাবিলাসী তপশিলি হিন্দু নেতা যোগেন্দ্রনাথ মণ্ডল। বাবাসাহেব আম্বেদকরের সাবধানবাণী না শুনে যিনি মুসলিম লিগের প্রতারণার ফাঁদে পা দিয়েছিলেন। পাকিস্তানের প্রথম আইনমন্ত্রী হয়েও ১৯৪৯-৫০ সালে পূর্ববঙ্গে নিজের চোখের সামনে একের পর এক হিন্দু গণহত্যা দেখে স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিলেন তিনি। অল্পদিনের মধ্যেই বুঝতে পেরেছিলেন যে 'দলিত-মুসলিম ঐক্য' আসলে সোনার পাথরবাটি। ১৯৫০ -এর ৮ অক্টোবর প্রাণ বাঁচাতে তিনি সপরিবারে চলে এলেন পশ্চিমবঙ্গে। ওইদিন বিবেকের দংশনে তিনি পাকিস্তানের মন্ত্রীসভা থেকে পদত্যাগ করলেন আর লিপিবদ্ধ করে গেলেন মুসলিম লিগের বিশ্বাসঘাতকতার ভয়ংকর ইতিহাস।

যোগেন মণ্ডলের পদত্যাগ তাই ইসলামের দ্বারা তপশিলি হিন্দু সমাজের উপর ঘটে যাওয়া সর্বনাশের প্রমাণপত্র। অর্থাৎ আজকের দিনেই অবশিষ্ট ভারতের তপশিলি হিন্দুসমাজকে 'দলিত-মুসলিম ঐক্য' নামক সর্বনাশের গ্রাস থেকে বাঁচানোর জন্য যোগেন মণ্ডলের মোহমুক্তি ঘটেছিল। তাই এই দিনে বাঙ্গালি হিন্দুর 'মোহমুক্তি দিবস'। আসুন আমরা প্রতিবছর ৮ অক্টোবর দিনটিতে রাজ্যজুড়ে ঐতিহাসিক মোহমুক্তি দিবস পালন করি। যাতে সেই সর্বনাশা ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি আর না ঘটে। আজ থেকে মন থেকে বলি—মুখে হাসি, বুকে বিষ, মিছে ছলনার দ্বারা ভুলব না। মূলনিবাসী দলিত-মুসলিম ঐক্য অলীক, ঘুঘুর ফাঁদে পা দেব না। ''জয় হরিবোল, জয় হরিচাঁদ, জয় মা সত্যভামা''।

—দীপক খাঁ,
পাটপুর, বাঁকুড়া।

লক্ষ্মীকে মানুষ করতে কালির জীবনযুদ্ধ

স্বাতী চট্টোপাধ্যায়

দেশজুড়ে এখন মাতৃশক্তির আরাধনার আয়োজন চোখে পড়ার মতো। ইতিমধ্যেই মা দুর্গা কৈলাশে পাড়ি দিয়েছেন। কালীপুজোও শেষ। একবছর পর শক্তিরূপিণী মা আবার তাঁর সন্তানদের চাওয়া-পাওয়া, মনস্কামনা পূরণ করতে ধরাধামে আবির্ভূত হবেন, তাঁদের জীবনের সব অন্ধকার দূর করে আলোর বার্তা বয়ে আনবেন— এই আশায় দিন গোনা শুরু হলো অগণিত সাধারণ মানুষ থেকে ভক্তকুলের। মাতৃশক্তির এই আরাধনায় প্রতি বছর শামিল হন ওরাও। ওরা মানে বাস্তবের মহামায়া,লক্ষ্মী, কালিরা।

সল্টলেকের সেক্টর ফাইভে বড়ো রাস্তার মোড় থেকে যে রাস্তাটা দু'ভাগে ভাগ হয়ে গিয়েছে, তার একভাগে রাস্তার একেবারে ধার ঘেঁষে দাঁড়িয়ে রয়েছে মহামায়ার হোটেল। হোটেলের বাইরে টিনের সাইনবোর্ডে তেলরঙের লেখা এখনও জ্বলজ্বল করছে। তবে ভিতরটা একেবারেই সাদামাটা। চারটে নড়বড়ে চেয়ার টেবিল পাতা। পুরনো হলেও পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। হবে নাই-ই-বা কেন! ''পাবলিকের ডিমান্ড তো মানতেই হবে। তাঁরাই তো আমার লক্ষ্মী'' —বললেন স্বয়ং মহামায়া। মানে হোটেলের মালকিন, কেয়ারটেকার, রাঁধুনি মহামায়া নস্কর। একেবারে যাকে বলে সাক্ষাৎ দশভুজা।'' সেই কোন ছোটবেলা থেকে সংসারের জোয়াল টানতে টানতে হাড়মাস কালি হয়ে গেছে। আমার কাছে পুজো মানে একটাই। তা হলো আমার দোকানের কাস্টমারদের পেটপুজো। মানুষকে নিজের হাতে রান্না করে খাইয়ে যে সুখ আমি পাই, তা তোমাদের এই দুর্গাপুজোই বলো আর কালীপুজোই বলো কোনও পুজোরই আনন্দের চেয়ে কিছু কম নয়'', কথাগুলো বেশ গর্বের সঙ্গে বললেন মহামায়া। শুধু তাই নয়, এই হোটেল চালিয়েই তিনি তার একমাত্র মেয়েকে ইঞ্জিনিয়ারিং পড়াচ্ছেন। তাঁর দুচোখ জুড়ে এখন একটাই স্বপ্ন, 'আজ বাদে কাল মেয়ে আমার মস্ত চাকরি করবে।'

বাস্তবের মহামায়ারা এভাবেই প্রতিনিয়ত নিজেদের নিংড়ে দিয়ে বেঁচে থাকার লড়াইয়ে শামিল হয়েছেন। এও তো আদ্যাশক্তিরই এক

রূপ। অন্যদিকে আবার বছর পনেরোর কিশোরী কালী তাঁর পাঁচ বছরের বোন লক্ষ্মীকে মানুষ করার জন্য নিজের সবটুকু শক্তি দিয়ে জীবনযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েছে। মধ্যমগ্রামে বাজারের এককোণে তার একফালি দোকান। সেই ছোট্ট দোকানটিতে পরিপাটি করে সাজানো রয়েছে নানারকমের বাহারি মাটির প্রদীপ, পুতুল, বাঘ-সিংহ- হাতি-ঘোড়া আরও কত কী! এর সঙ্গে রয়েছে ফুলের মালা। কালির নিজের হাতে গড়া মাটির জিনিস আর ফুলের মালা তার উন্নত শিল্পীজাতকে বেশ ভালোভাবে চিনিয়ে দেয়। তবে হবে না-ই বা কেন! মাটির তৈরি জিনিস গড়ার দক্ষ কারিগর বাব-মায়ের কাছেই কালির হাতেখড়ি। লেখাপড়া শেখার ইচ্ছে থাকলেও, সংসারের অভাব-অনটনের জন্য তা আর হয়ে ওঠেনি। তার ওপর এক দুর্ঘটনায় বাবা-মায়ের আচমকা মৃত্যু কালিকে যেন একনিমেষে অনেকটাই প্রাপ্তমনস্ক করে তোলে। কালির জীবনের এখন একটাই লক্ষ্য, যেভাবেই হোক বোনটাকে মানুষ করতে হবে। কারণ কালি এখন শুধু লক্ষ্মীর দিদি নয়, মা-ও বটে।

কিশোরী বয়সে অভিভাবকের দায়িত্ব পালন করতে করতে বাস্তবের কালি প্রকৃতই শক্তিরূপিণী হয়ে উঠেছে। সারাদিন দোকান সামলে রাতে সে তার অধরা স্বপ্ন পূরণ করার জন্য একটি অবৈতনিক স্কুলে লেখাপড়াও করে। আর লক্ষ্মী, সে তো প্রায় জন্মলগ্ন থেকেই লড়াইয়ের ময়দানে নেমে পড়েছে। দিদির মতোই সেও আস্তে আস্তে জীবনযুদ্ধে দক্ষ যোদ্ধা হয়ে উঠছে। এভাবেই দিদি আর বোন মিলে প্রতিনিয়ত ছোট ছোট কুঁড়ি গেঁথে সম্পূর্ণ একটি মালা গাঁথার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। হয়তো সেই মালাই একদিন মাতৃশক্তির আরাধনায় যোগ্য উপকরণ হয়ে উঠবে।

যে মাতৃশক্তির পুজোয় আমরা প্রতিবছর মেতে উঠি, সেই শক্তিরই বাস্তব রূপ এইসব নারীরা। মৃন্ময়ী প্রতিমার বিসর্জন হলেও, চিন্ময়ী মহামায়া, লক্ষ্মী, কালিদের বিসর্জন হয় না। সূর্যোদয় থেকে সূর্যাস্ত এরা জীবনে টিকে থাকার লড়াই চালিয়ে যায়। সেই লড়াইয়ে তাঁরা যথার্থ শক্তিরূপিণী আদ্যা মায়ের মতো অধিষ্ঠান করেন। □

ভিটামিনের প্রতি বেশি আগ্রহ ভালো নয়

ডাঃ পার্থসারথি মল্লিক

বিজ্ঞাপনী চমকে নানারকম ভিটামিনের প্রতি সাধারণ মানুষের বেশ আগ্রহ। দুর্বল লাগা, গা-হাত-পা ব্যথা করা, হাত-পা ঝিঁঝি করা, এমন নানা অজুহাতে ভিটামিন,

ক্যালসিয়াম ইত্যাদি খেয়ে যান অনেকে। কখনোও চিকিৎসককে অনুরোধ করেন ভিটামিন লিখে দিতে। আবার অত্মীয়স্বজন, বন্ধু-বান্ধবরাও পরামর্শ দেন 'আমি তো এই ভিটামিন, ওই ভিটামিন খাই, আপনিও খেয়ে দেখুন।' কিন্তু প্রয়োজন ছাড়া কোনো ওষুধই খাওয়া উচিত নয় এবং তা যে শরীরের পক্ষে ক্ষতিকর, তা তাঁরা মনে রাখেন না। ভিটামিন, ক্যালসিয়াম, আয়রন আমাদের রোজকার খাদ্য উপাদানের অংশ, কিন্তু এগুলো ওষুধ হিসেবে দিনের পর দিন, মাসের পর মাস গ্রহণ করা শরীরের ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়াতে পারে। যারা শারীরিক দুর্বলতার দরুন এসব সেবন করেন, তাদের অনেকের কিন্তু এসব ওষুধের প্রয়োজন নেই, বরং এসবের কারণে ক্ষতি বা পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া হতে পারে। জেনে রাখা ভালো, পুষ্টির উপাদানের অভাব যেমন শরীরের জন্য ক্ষতিকর, তেমনই এগুলোর আধিক্যও শরীরের পক্ষে ক্ষতিকর।

দুর্বলতা বোধ হলেই ভিটামিনের প্রয়োজন নেই। দুর্বলতার কারণ শারীরিক কোনো অসুস্থতা। পুষ্টি উপাদানের অভাবেই শরীর দুর্বল হয়, তা নয়। তাই হঠাৎ ওজন কমা বা দুর্বলতা, মাথা ঘোরা, ক্লান্তি ইত্যাদি উপসর্গের কারণ জানা জরুরি। কারণ অনুসন্ধানের চেষ্টা না করে ভিটামিন ট্যাবলেট খেয়ে চললে মূল রোগটি শনাক্ত হবে না। ফলে রোগটি আরও জটিল হয়ে ওঠার সুযোগ পাবে। আবার পুষ্টি উপাদানের ঘাটতিজনিত দুর্বলতার ক্ষেত্রেও চিকিৎসকের তত্ত্বধান ছাড়া দীর্ঘমেয়াদে এসব ওষুধ সেবন করা অনুচিত। এসব উপাদানের আধিক্য হলে পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া হিসেবে মাথাব্যথা, মাথা ঘোরা, ক্ষুধামান্দ্য, বমি, পাতলা পায়খানা, কোষ্ঠকাঠিন্যও হতে পারে। এমনকী ওষুধের কারণেই আসতে পারে দুর্বলতা, ক্লান্তি ও অবসন্নতা। শরীরের কর্মক্ষমতা কমে যেতে পারে, কিডনি ও লিভার ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে।

শরীরব্যথার জন্য অনেকেই ক্যালিসিয়াম সেবন করতে থাকেন। কিন্তু শরীরে ক্যালসিয়ামের মাত্রা বেড়ে গেলে শরীরের অভ্যন্তরে তা কোথাও জমা হতে থাকে। এর ফলে পিত্তথলি বা কিডনিতে পাথর হতে পারে। পুষ্টি উপাদানের ঘাটতিই যদি দুর্বলতার কারণ হিসেবে চিহ্নিত হয়, তখন চিকিৎসক পরিমিত মাত্রায় নির্দিষ্ট সময়ের জন্য সাপ্লিমেন্ট বা পরিপূরক সেবন করার পরামর্শ দিতে পারেন। পুষ্টি উপাদান ঘাটতির পেছনেও নানা কারণ থাকে। সেই কারণ খুঁজে বের করা না হলে ঘাটতি রয়েই যাবে।

গর্ভবতী ও স্তন্যদানকারী মায়েদের জন্য সাধারণত আয়রন ট্যাবলেটের প্রয়োজন পড়ে। তবে রক্তশূন্যতা হলেই যে আয়রন ট্যাবলেট খেলে লাভ হবে, তা নয়। রক্তশূন্যতার নানান ধরন থাকে। সকল ধরনের রক্তশূন্যতা আয়রনের অভাবে হয় না। তাই আয়রন ট্যাবলেট সেবন করলেই সব রক্তশূন্যতার উপশম হয় না। আর আয়রনের অভাবজনিত রক্তশূন্যতার কারণটি খুঁজে বের না করতে পারলে অবস্থা জটিল হতে পারে। তাছাড়া আয়রন সেবনের বিধিনিষেধও আছে। আয়রন ট্যাবলেটের সঙ্গে টক জাতীয় খাবার গ্রহণ করলে আয়রন ভালোভাবে শরীরে পরিশোধন হয়। অন্যান্য কিছু খাবারের সঙ্গে খেলে ঘটে উলটোটি। আবার কয়েকটি ওষুধের সঙ্গে আয়রন গ্রহণ করা হলে ওষুধের কার্যক্ষমতা কমে যেতে পারে। তাই চিকিৎসকের পরামর্শ ছাড়া আয়রন ট্যাবলেট গ্রহণ করা উচিত নয়।

কারও কারও ক্যালয়িাম, ভিটামিন ডি দীর্ঘদিন ধরে সেবন করার প্রয়োজন হতে পারে। যেমন বয়স্ক ব্যক্তি, মেনোপেজ-পরবর্তী মহিলা, দীর্ঘদিন হাড়ের ক্ষয়ে আক্রান্ত ব্যক্তি। সেটাও চিকিৎসকরা একটা নির্দিষ্ট ডোজ বা মাত্রা ঠিক করে দেন। প্রতিটি ভিটামিন সেবনরই মাত্রা ও মেয়াদ আছে। অনেকেই মাসের পর মাস ভিটামিন ডি খেয়ে যান, কিন্তু কখনোই মাত্রা পরীক্ষা করে দেখেননি। কত ইউনিট কত দিন খাবেন তা ভালোভাবে জেনে নিতে হবে। ভিটামিন ডি বেশিদিন খেলে টক্সিকোসিস হতে পারে। ক্যালসিয়ামের ক্ষেত্রেও একই কথা।

সুস্থ থাকতে গেলে সুষম খাদ্যাভ্যাস গড়ে তোলা জরুরি। রোজই প্রয়োজনীয় পুষ্টি উপাদান গ্রহণ করতে হবে প্রায়োজনীয় পরিমানে। বিশেষ খেয়াল রাখতে হবে শিশু, নারী ও বয়স্ক ব্যক্তির প্রতি। শিশুরা অনেক সময় পছন্দমতো খাবার না পেলে খেতে চায় না। বয়স্ক ব্যক্তিদের ক্ষেত্রেও এরকম হতে পারে। পরিবারের মেয়েরা সবার পুষ্টি নিশ্চিত করতে গিয়ে নিজেদের দিকে খেয়াল রাখেন না। কেউ দীর্ঘমেয়াদি রোগে ভুগলেও অপুষ্টির শিকার হতে পারেন। সবার সুষম পুষ্টি ও খাদ্যাভ্যাস নিশ্চিত করতে পারলে ভিটামিন বা অন্যান্য পুষ্টি উপাদান ওষুধ হিসেবে সেবন করার প্রয়োজনই পড়ে না। □

মোদিকে হটাতে সক্রিয় আন্তর্জাতিক দুনিয়া

ড. রাজলক্ষ্মী বসু

"হাউই কহিল, মোর কী সাহস, ভাই,
তারকার মুখে আমি দিয়ে আসি ছাই!
কবি কহে, তার গায়ে লাগে নাকো কিছু,
সে ছাই ফিরিয়া আসে তোরি পিছু পিছু।"

মিথ্যে অপপ্রচার যারা করে, তাদের দশা এই হাউইয়েরই মতো। সারা বিশ্বের দরবারে যখন ভারত তার উন্নতির প্রগতির প্রত্যুষ রচনা করছে, যখন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর জনপ্রিয়তার প্লাবন অবিরাম, ঠিক সেটাই তো নিন্দুকদের উপযুক্ত সময় মিথ্যা ধিক্কারে নরেন্দ্র মোদী তথা ভারতের ওপর নিন্দার দীর্ঘশ্বাস মোচন করবার। সেই নিন্দুকদের আয়তন এদেশের লেফ্ট লিব্যারাল থেকে শুরু করে পশ্চিমের অন্য দেশের একদল সংবাদমাধ্যম পর্যন্ত বিস্তৃত। বিভ্রান্তিমূলক তথ্য এবং সংবাদ পরিবেশনে তাদের আয়োজনের যতই ঘনঘটা থাকুক না কেন, যুক্তি, প্রকৃত তথ্য এবং মোদীর কার্যসিদ্ধির কাছে তারা যেন বারে বারে হেমন্তের আসন্ন রৌদ্রের মতোই ম্লান হয়ে যায়। তাদের মিথ্যার ফাঁদ ও অপপ্রচারে মানুষকে আচ্ছন্ন হওয়ার সুযোগ দেয় না মোদীর দেশদরদি কল্যাণবর্ষী কর্মযজ্ঞ। অপপ্রচারের প্লাবন শুরু হয়েছিল করোনা সময়কাল থেকে। যখন বিশ্বের তাবড় ধনবান সব রাষ্ট্রনেতারা নিজ নিজ রাষ্ট্র পরিচালনায় মুখ থুবড়ে পড়ছেন, তখন মোদীর পরিচালনায় ভারত তার আত্মনির্ভরতা, স্বকীয়তা এবং কোভিড মোকাবিলায় স্বাবলম্বিতার দৃষ্টান্ত স্থাপন করল।

একটা উদাহরণে স্পষ্ট হবে কেন একটা শ্রেণীর এতো মোদী অ্যালার্জি প্রকট হলো। প্রায় ১৬ কোটি ভারতবাসীর (১১.৫ শতাংশ জনগণ) প্রধানমন্ত্রী জন আরোগ্য যোজনাতে নথিভুক্তকরণ সম্পন্ন হচ্ছে, লক্ষ্য করি ঠিক

সেই সময় থেকেই পশ্চিমি দেশের একাধিক সংবাদমাধ্যম মোদী বিরোধী হয়ে ওঠে। ততক্ষণে আনুমানিক ১.৮৫ কোটি মানুষের সম্পূর্ণ বিনামূল্যের চিকিৎসা নেওয়ার পরিকাঠামো সম্পন্ন। প্রধানমন্ত্রী ভারতীয় জনৌষধি পরিযোজনা ন্যূনতম মূল্যে ওষুধ প্রদান করছে। জেনেরিক ড্রাগ দিচ্ছে যা বিদেশি সংস্থার তুলনায় ৯৩ শতাংশ স্বল্প মূল্যের। যেমন বলি, অ্যান্টি র‍্যাবিস ইনজেকশনের মূল্য ৫২.৩ শতাংশ হ্রাস করা হলো এবং কমপক্ষে ৭,৭০০ টি কেন্দ্র নির্মিত হয়। তার ওপর প্রধানমন্ত্রী বিমা যোজনা, এবং ২৪ কোটি মানুষের নাম নথিভুক্ত হলো প্রধানমন্ত্রী সুরক্ষা বিমা যোজনাতে। ব্যাস! এইতো অভিযোগের মূল কারণ, বিদেশি স্বাস্থ্য বিমাসংস্থার রাগ, অনেক বিদেশি ওষুধ সংস্থার ক্ষোভ এবং তা আছড়ে পড়ল মোদী বিরোধী মিথ্যা প্রচারে। তাই ভালোভাবে লক্ষ্য করলে দেখা যাবে তীব্র মোদী বিরোধিতা মোমেন্টাম পেল করোনা কালেই। এই নেই, ওই নেই, জর্জরিত ভারত—বিশ্বের দরবারে মোদী পরিচালিত ভারতকে ছোটো করছে নিউইয়র্ক টাইমসের মতো পত্রিকা। পরিকল্পিতভাবে যখন প্রতিবেদন প্রকাশিত হচ্ছে— এ দেশে অক্সিজেন নেই। ঠিক তারই মধ্যে পি এম কেয়ারস ফান্ড (৫ জানুয়ারি ২০২১) ২০২.৫৮ কোটি টাকার মোট ১৬২ টি অক্সিজেন প্ল্যান্ট (ক্যাপাসিটি ১৫৪.১৯ এম টি পি ডি) সরবরাহ করেছে। তবুও মোদী কিছুই করেনি! এই উদাহরণ করোনাকালের হিমশৈলের চূড়ামাত্র। আরও যদি বলা যায় সেন্ট্রাল ভিস্তা প্রকল্পের কথা। মোদী সরকার কোভিড পরিকল্পনা না করে নতুন সংসদভবন স্থাপন করছেন। সমুদ্র পার করে গেল গেল রবে রিপোর্ট চলল, এতো অর্থ ব্যয় করে কোন আক্কেলে! এও এক বিরাট অপপ্রচার যেখানে investment এবং expenditure এর অর্থ গুলিয়ে দেওয়ার অপচেষ্টা চলে। যে সপ্তবার্ষিকী প্রকল্পের বাজেট ১৩,৪৫০ কোটি টাকা তার ১,৩৩৯ কোটি বরাদ্দ ছিল ২০২০ থেকে ২০২২ এর আগস্ট পর্যন্ত, যার সঙ্গে কোভিড মোকাবিলার বিন্দুমাত্র যোগ ছিল না।

মোদীর অভিভাবকত্বে এদেশ কতটা স্বাবলম্বিতা অর্জন করেছে তা করোনার মতো সঙ্কট সময়েই প্রমাণিত হলো। যখন দেশবাসী বিনামূল্যের রেশন পাচ্ছে তখন আমরা প্রত্যক্ষ করলাম ইয়ালো জার্নালিজম কাকে বলে। চীনের গ্লোবাল টাইমস লিখছে, ''now oxford economics warned that the brutal Coronavirus resurgence in India would raise concerns that Indian economy's nascent recovery will be derailed...'' তার পরেরটা আর রিপোর্ট করার সাহস রাখেনি গ্লোবাল টাইমস। ভারত অর্থনৈতিক বৃদ্ধিতে বিশ্বের প্রথম পাঁচে স্থান পেল। ছাপিয়ে গেল ইংল্যান্ডকে।

সদ্য প্রকাশিত ইন্টারন্যাশনাল মানিটরি ফান্ডের তথ্যানুযায়ী চলতি বছর ভারতের অর্থনৈতিক বৃদ্ধির হার ৭ শতাংশ এবং আগামী ২০২৭-এ গ্রস ডোমেস্টিক প্রোডাক্টে বিশ্বের চতুর্থ স্থান দখল করবে। এক দশক আগেও যে এশিয়ান দেশের আন্তর্জাতিক অর্থনীতিতে ১১ তম স্থানে ছিল সে যদি মোদীর পরিচালনায় এমন হাই জাম্প দেয়, তা তো চীনের মতো দেশের ঈর্ষা ও মাথাব্যথার কারণ হবেই। ভারত হয়ে ওঠছে গ্লোবাল ইনভেস্টমেন্ট হাব। বিনিয়োগকারীরা চীনের উৎপাত থেকে পরিত্রাণ চাইছে। এমনকি মাওবাদী জি শিন পিঙের উৎপাতে চীনা বিনিয়োগকারীরাও ভারতে আসতে চাইছে। করোনার সময়েই কাটা ঘায়ে নুনের ছিটে দিল ভারত—চাইনিজ অ্যাপসমূহ এবং পুতুল আমদানিতে সম্পূর্ণ 'না' এঁকে। চীন নানাভাবে ভারত বিদ্বেষী অপপ্রচার শুরু করে। কখনও স্নায়ুযুদ্ধ তো কখনও পাকিস্তান প্রীতি প্রদর্শনে তারা ভারতকে ভীত করতে চায়। শেষমেশ ফল দাঁড়াল, নরেন্দ্র মোদীর জনপ্রিয়তা বিশ্বের এক নম্বরে এবং মাওবাদী শি জিনপিং জনতার রোষে গৃহবন্দি।

মোদী অপপ্রচারের প্রধান কারণ হিসেবে বলা যায় নিও নর্ম্যালে ভারতের অথনৈতিক শ্রীবৃদ্ধি। মোদীর ভক্তিগান গাইছি এমন ভাবার কারণ নেই। এ তথ্য দিয়েছেন হানস টিমার। বিশ্ব ব্যাংকের দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার মুখ্য কর্তা স্বয়ং বলছেন, The Indian economy has done well compared to the other countries in South Asia অক্টোবরের প্রথম সপ্তাহের রিপোর্ট বলছে ২০২২-২৩ অর্থবর্ষে ভারতীয় অর্থনীতির বৃদ্ধি ৬.৫ শতাংশ। যেখানে তথাকথিত উন্নত দেশগুলিতে ক্যাপিটাল আউট ফ্লোতে শীর্ণতার ছোঁয়া সেখানে ভারত 'very actively reacted to the COVID crisis'। এরমধ্যেই আমেরিকা আরও এক ফন্দি এঁটেছে। এই বছরেই সেপ্টেম্বরে তারা পাকিস্তানকে পুনরায় সেনা সহযোগিতার হাত বাড়িয়েছে। এফ-১৬ সাসটেইনমেন্ট প্রোগ্রামের অজুহাতে ৪৫০ মার্কিন মিলিয়ন অর্থ সাহায্য করল। একে মোদীর জনপ্রিয়তা এবং ভারত বিকাশের পরশ্রীকাতরতার ফল বললে অত্যুক্তি হবে না বোধ হয়।

ভারত ও পাকিস্তান দুই প্রতিবেশী দেশই আজ IT তে বিশ্ববন্দিত, ভারতের IT সবাই জানে। এর নাম কেবল ইনফরমেশন টেকনোলজিই নয়, এর নাম ইন্ডিয়া ট্রান্সফরম। আর পাকিস্তানের IT-র নাম ইন্টারন্যাশনাল টেররিজম। যেখানে নরেন্দ্র মোদীর প্রয়াস অব্যাহত, এশিয়া এবং সমুদ্র জল নির্ভর সন্ত্রাসমুক্ত পরিবেশ গঠনে যখন তিনি অগ্রণী ভূমিকায়, জাপান অস্ট্রেলিয়ার সঙ্গে সাফল্যের সঙ্গে সন্ত্রাসমুক্তকরণে চুক্তিবদ্ধ; ঠিক তখনই আমেরিকার পাকিস্তান প্রীতির পুনর্নবীকরণ হয়। এই পাকিস্তানেরই ৭৫ তম স্বাধীনতা দিবসে বিদেশ মন্ত্রী জাহিত জাফেদ চৌধুরী যশস্বী মোদীর উদ্দেশ্যে অপপ্রচারে বলেছিলেন, A political and publicity stunt, এও বলেছিলেন No modern state is so much in contradiction with itself as the Indian state, the so called ''largest democracy.''

হিন্দুত্ব আইডিওলজির তেজদীপ্ততা সহ্য হচ্ছে না যে পাকিস্তানের, তাই এই মন্তব্য। কিন্তু মোদীর সাফল্য ও স্বতন্ত্রতা এখানেই, তিনি একাধারে যেমন সন্ত্রাসমুক্ত এশিয়া গঠনে পাকিস্তানের সমালোচক আবার অন্যদিকে পাকিস্তানে বন্যা (হড়পা বান) বিপর্যয়ে সমব্যাথী ও সাহায্যকারী প্রতিবেশী রাষ্ট্রনায়ক। ইমরান খানের মতো সুপার ফ্লপ এক সন্ত্রাসী দেশনেতা নরেন্দ্র বিরোধিতার পরেও মোদীকে সততার ভাবমূর্তি হিসেবে উত্থাপিত করেন, মোদী বন্দনা করতে বা বলা ভালো উদাহরণ আনতে বাধ্য হয়। এমনকী ইমরান খান অনেক ঢোক গিলেও মোদীর

বিদেশ নীতির প্রশংসা করেছিলেন। খানের মুখ থেকেই শোনা গিয়েছিল 'khuddar quam' (আত্মমর্যাদাশীল মানুষ)। তাই আমেরিকা, চীন নানাভাবে সন্ত্রাস জিইয়ে রাখতে চায়। তারা সরাসরি সন্ত্রাস করে না, কিন্তু সন্ত্রাসমুক্ত এশিয়া গঠনে ভারত সাফল্য পেলেই এই দুই সুপার জায়েন্ট কান্ট্রি পাকিস্তানের মতো সন্ত্রাসী দেশকে উসকে দেয়। তার পরেও ইউনাইটেড নেশনস জেনারেল অ্যাসেম্বলিতে মোদীর mother of democracy তত্ত্বে জো বাইডেন ঘাড় নাড়েন। সারা বিশ্বের কাছে কাশ্মীরকে ভারতের ইন্টিগ্রাল অংশ হিসেবে মোদীই প্রতিষ্ঠিত করলেন। তাই যারা সন্ত্রাসীদের সাহস ও অর্থ মদত দেয় তাদের জ্বালা তো হবেই।

আরও একটি ইস্যু মোদী তথা ভারতের অপপ্রচারের বেশ রমরমা। গ্লোবাল হাঙ্গার ইনডেক্স। ২০২২ এ সমীক্ষা চালানো ১২১টি দেশের মধ্যে ভারতের অবস্থান বুঝি ১০৭-এ! স্কোর ২৯.১—"মিথ্যারও একটা মাহাত্ম্য আছে"—ভারতের আগে শ্রীলঙ্কার অবস্থান। যে দ্বীপরাষ্ট্রের হাহাকারে আমাদেরই খাদ্য ওষুধ এবং সব প্রয়োজনীয় টুকু সরবরাহ করতে হলো, শেষে কিনা অপপ্রচারের গুঁতোয় ভারত তাদের থেকেও পিছিয়ে পড়ল। স্ট্যাটিসস্টিকস কি এতোটাই হেঁয়ালীর হয়! প্রথম এই সমীক্ষাটি করেছে Gallup নামক এক আমেরিকান সার্ভে টিম। যারা টেলিফোনিক ওপিনিয়ান পোল ব্যবহার করেছে এবং স্যাম্পেল সংখ্যা মাত্র ৩০০০, যা অবৈজ্ঞানিক এবং মেরিটলেস। শুধু তাইই নয়, তারা 'ফুড ইনসিকিউরিটি এক্সপেরিএন্স স্কেল' ব্যবহার করেছে যা গ্লোবাল হাঙ্গার ইনডেক্স গতবছর থেকে স্বীকৃতি দিচ্ছে না। আরও মারাত্মক তঞ্চকতা এই যে, এই গোঁজামিলের সমীক্ষা 'completely disregarded the government's economic response to Covid 19 of providing free foodgrains to 80 crore (800 million) people under the National Food Security Act"!

বিবিসি, ওয়াশিংটন পোস্ট, নিউ ইয়র্ক টাইমস, গার্ডিয়ান, ডেইলি মেইল, গ্লোবাল টাইমস সব একজোটে মাঝে মাঝেই মোদীকে

ইমরান খানের মতো সুপার ফ্লপ এক সন্ত্রাসী দেশনেতা নরেন্দ্র বিরোধিতার পরেও মোদীকে সততার ভাবমূর্তি হিসেবে উত্থাপিত করেন, মোদী বন্দনা করতে বা বলা ভালো উদাহরণ আনতে বাধ্য হয়। এমনকী ইমরান খান অনেক ঢোক গিলেও মোদীর বিদেশ নীতির প্রশংসা করেছিলেন।

হিংসে করে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা যখন একযোগে ভারতের প্রশংসায় পঞ্চমুখ তখন পশ্চিমি দেশের মিডিয়ার গাত্রদাহ। ওয়ার্ল্ড ইকনমিক ফোরাম যেই না বলল Modi saved humanity from a big disaster... অমনি আরও এক নেগেটিভ রিপোর্ট প্রকাশ পেল ডলার বনাম ভারতীয় টাকা। হ্যাঁ, এক আমেরিকান ডলার মানে ভারতীয় মুদ্রার ৮০ টাকা। কিন্তু এতো অশ্বত্থমা হত! 'ইতি গজ' তো বলা হচ্ছে না।

ভারতীয় মুদ্রার দাম ডলারের তুলনায় কমেছে ৬.৫১ শতাংশ। কিন্তু উল্লেখ হচ্ছে না, ভারতীয় মুদ্রার মূল্য অস্ট্রেলিয়ান ডলারের তুলনায় বেড়েছে ১ শতাংশ। দক্ষিণ আফ্রিকা, চীন, নিউজিল্যান্ড, দক্ষিণ কোরিয়া, ব্রিটেন, জাপান ও পাকিস্তানের তুলনায় বেড়েছে যথাক্রমে ২, ২.২, ৫.৩৫, ৮.২৬, ৭.৮, ১২.৮ ও ১৭ শতাংশ। অর্থাৎ ডলারের তুলনায় সবচেয়ে কম মুদ্রার অবমূল্যায়ন ভারতের। অনুমেয় মোদী অপপ্রচারের মাত্রা তীব্রতর হবে। এবছর জুন মাসে যে আরও এক ঈর্ষার তথ্য প্রকাশ্যে এসেছে India is still the third largest economy in terms of purchasing power parity–যা একটা দেশের প্রকৃত শ্রীবৃদ্ধির ধ্রুবক। এই অবস্থানে অবশ্য ২০১৭-তেই ভারত আসে। কিন্তু করোনা ঝড়ের পরেও অনড় অবস্থান ভারতের অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতার ও শ্রীবৃদ্ধির স্বতঃসিদ্ধতা প্রতিষ্ঠিত করল। একটা সময় গার্ডিয়েনের সম্পাদকীয় কলম মোদীকে কটাক্ষ করে লিখেছিল--- 'overconfidence'! না এর নাম আত্মবিশ্বাস এবং প্রকৃত আত্মনির্ভর ভারত।

একটা বিশাল কর্মযজ্ঞে সবকিছু নিখুঁত হতে পারে না। মোদীর হাতে ভারতের অনেক পথ অগ্রসর হওয়া বাকি। যে কোনো গঠনমূলক সমালোচনার একটা ইতিবাচক দিক থাকে। কিন্তু অপপ্রচার কেবলমাত্রই বিভ্রান্তির রসদ যোগায়।

ভারতের 'MODI-fication' হয়েছে, হচ্ছে অতএব হিংসে তো হবেই। নরেন্দ্র মোদীর জনপ্রিয়তার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর বিশেষ গুরুত্ব পুনরায় প্রমাণিত হলো BRICS সম্মেলনে। যেখানে দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার সন্ত্রাসমুক্ত অঙ্গন গঠনে তাঁর বক্তব্যকে শিরোধার্য করা হয়েছে। জি-৭ বৈঠকেও মোদী আমন্ত্রিত হন। ইউক্রেন সংকট হোক কিংবা আফগানিস্তান যুদ্ধ --ভারতের কূটনৈতিক পরিপক্কতার সঙ্গে এঁটে উঠতে পারছে না কোনো দূরভিসন্ধি। ইউনাইটেড নেশনস থেকে ওয়ার্ল্ড ট্রেড অরগানাইজেশন সর্বত্র মোদী হাওয়া, তাই এর প্রতিপক্ষ হিসেবে অপপ্রচার ছাড়া আর কীই-বা থাকতে পারে। উল্লেখ করতেই হচ্ছে সাংহাই কোয়াপারেশন অরগানাইজেশন, যা নরেন্দ্র মোদীর কূটনৈতিক বোধের স্পষ্ট দলিল, যা "difficult to theorize but easy to understand".

Neighbourhood first diplomacy-তে মোদীর সিদ্ধহস্ত চলাচল আমেরিকার হালকা ভ্রূকুটির কারণ। এককথায় রাষ্ট্র নায়কের আবেদনে তিনিই বন্দিত তিনিই ঈর্ষীত।

তবে হ্যাঁ, অপপ্রচারের সঙ্গে মোদী বেশ গা-সওয়া। একজন চা ওয়ালার হাতে এই ট্রান্সফরমেটিভ ইন্ডিয়া যে সারা বিশ্বের কাছেই চমক। শুরুটা হয়েছিল অনেক আগে। ১৯৫৯ সালে, নরেন্দ্র মোদী তখন ভাদনগর স্কুলের ছাত্র। 'পিলা ফুল' নামে একাঙ্ক এক নাটক হয়েছিল সেদিন। যার লেখক পরিচালক ও চরিত্র উপস্থাপক ছিলেন নরেন্দ্র মোদী। একা মোদী যে বহুরূপে দক্ষ তার পূর্বাভাস হয়তো সেদিনই ছিল। স্কুলের মঞ্চ থেকে আজ আন্তর্জাতিক মঞ্চেও তিনিই হিরো। ■

নরেন্দ্র মোদীর বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিক ষড়যন্ত্র

নিখিল চিত্রকর

কোভিড-১৯ মারণ ভাইরাসের দরুন যখন তামাম দুনিয়ার অর্থনীতি অথই জলে সেই সময় ভারতের অর্থনৈতিক উত্থান নজর কেড়েছে অন্যান্য দেশগুলির। রাষ্ট্রনায়কদের মধ্যে কেউ কেউ ভারতের এই অগ্রগতির জন্য ঢালাও প্রশংসা করেছেন যশস্বী প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর। আবার অনেকেই জ্বলেপুড়ে মরছে ঈর্ষায়।

ভারতের মতো তৃতীয় বিশ্বের একটা দেশ ডেভেলপমেন্টের এক একটা সিঁড়ি অতিক্রম করে যাচ্ছে, পণ্য আমদানির নির্ভরশীলতা ঝেড়ে ফেলছে, সবাইকে টেক্কা দিয়ে দেশীয় পদ্ধতিতে করোনার ভ্যাকসিন আবিষ্কার করছে, মায় নিজের দেশের মানুষের ভ্যাকসিনের চাহিদা মিটিয়ে রপ্তানিও করেছে। এখানেই চোখ টাটিয়েছে তাবড় ওয়ার্ল্ড লিডারদের। একসময় 'করোনার প্রকোপে ভারতের মতো বৃহৎ জনসংখ্যার দেশ বিধ্বংসী প্রলয়ের মুখে পড়বে, ভারতের অর্থনীতি ভেঙে খান খান হয়ে যাবে, প্রায় ১০ কোটি ভারতীয়র মৃত্যু হবে'— ইত্যাদি ইত্যাদি বহু পূর্বাভাষে হাওয়া গরম করে দিয়েছিল বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংগঠন ও তাদের পরিসংখ্যান। তাতে মার্কিন মুলুক, চীন, পাকিস্তান-সহ বহু দেশই মনে মনে খুশি হয়েছিল। কিন্তু শত্রুর মুখে ছাই দিয়ে সেই সব পূর্বাভাষ ব্যর্থ করেছে নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বাধীন 'নতুন ভারত'।

স্বাধীন ভারতের ইতিহাসে লাল বাহাদুর শাস্ত্রী, পিভি নরসিংহ রাও ও অটলবিহারী বাজপেয়ী ছাড়া বাদবাকী প্রধানমন্ত্রীরা দাসত্ব মনোভাব থেকে কতটা মুক্ত হতে পেরেছিলেন তা নিয়ে যথেষ্ট সন্দেহ আছে। তাদের আমলে ভারতের বিভিন্ন অভ্যন্তরীণ বিষয়ে পদে পদে আমেরিকাকে নাক গলাতে দেখা গেছে। এমনকী কাশ্মীর বিষয়েও দাদাগিরি করেছে মার্কিন মুলুক। কারণ সেই সময়গুলোতে সামরিক শক্তি নিয়ে ওয়ানওয়ে ট্রাফিকের মতো তাদের ওপরেই নির্ভর করতে হতো ভারতকে। অথচ কেউ এই সমস্যাগুলো থেকে বেরিয়ে আসার উপায় খোঁজেনি। সবাই নিজের গদি সামলানোকেই ফার্স্ট প্রায়োরিটি হিসেবে দেখেছিলেন।

তবে ২০১৪-র পর ছবিটা বদলাতে শুরু করেছে। তথাকথিত উন্নত দেশগুলো ভারতকে নিয়ে আলাদা সমীকরণ তৈরি করতে বাধ্য হচ্ছে। কারণ এদেশের রাশ এখন নরেন্দ্র মোদীর শক্ত হাতে। গুজরাটের সেই কিশোর বয়সের চা-ওয়ালা নরেন্দ্র দামোদরদাস মোদী মুখ্যমন্ত্রী থাকাকালীন ২০০৫ সালে যাঁকে আমেরিকা সফরে ভিসা দিতে অস্বীকার করেছিল মার্কিন প্রশাসন। যিনি মুখ্যমন্ত্রীর

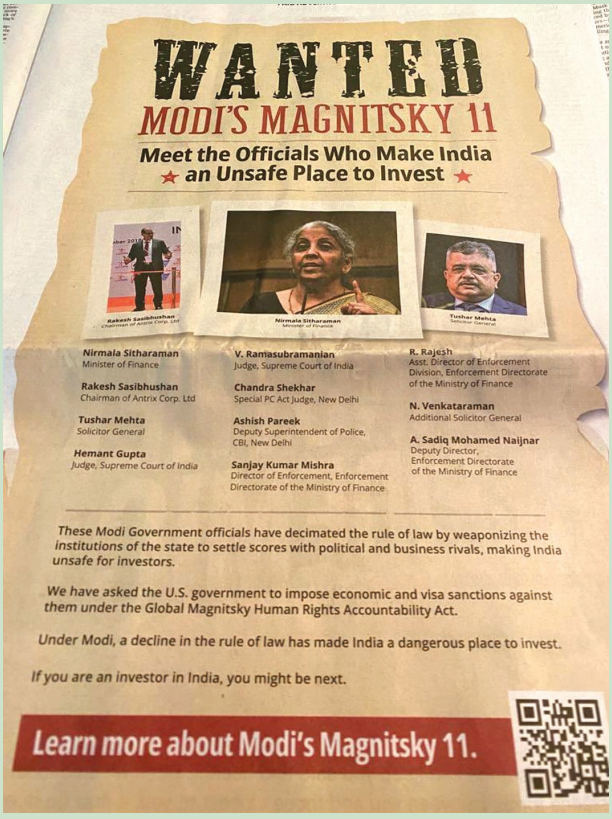

দায়িত্ব পাওয়ার পর গুজরাটের ভোল বদলে দিয়েছিলেন। বিপুল জনসমর্থন অর্জন করে তিনি প্রধানমন্ত্রীর পদে বসার সঙ্গে সঙ্গে এমন কিছু ইতিবাচক পদক্ষেপ নিলেন, যা যুগান্তকারী বললে অত্যুক্তি হবে না। কী করলেন তিনি? আর্থিক দিক দিয়ে পিছিয়ে থাকা মানুষকে দেশের আর্থিক ব্যবস্থার সঙ্গে জুড়ে দিলেন। দেশের ৭ কোটি প্রান্তিক পরিবারে পৌঁছে গেল 'প্রধানমন্ত্রী জন ধন যোজনা প্রকল্প'। এতদিনে ব্যাংকিং পরিষেবা উন্মুক্ত হলো প্রতিটি ভারতবাসীর জন্য।

২০১৬ সালে মোদী সরকার ঘোষণা করল ঐতিহাসিক নোটবন্দি। বস্তা বস্তা কালো টাকা রাতারাতি কাগজের স্তূপে পরিণত হলো। ভারতীয় টাকার জাল ব্যবসায়ীদের ধান্দাপানি বন্ধ হলো। সেইসঙ্গে চীন ও পাকিস্তানের তৈরি প্যারালাল ইকনোমির নেটওয়ার্ক ধ্বংস করে দিল মোদী সরকার ২০১৮-তে নরেন্দ্র মোদীর অন্যতম বৈপ্লবিক পদক্ষেপ হলো জিএসটি লাগু করা। সবকটা পদক্ষেপই বিরোধীদের কাছে 'বার্নাল মোমেন্ট'। চারদিকে গেল গেল রব উঠল। তার তরঙ্গ গিয়ে পৌঁছালো হোয়াইট হাউসে। মোদী কী করছেন, কেন করছেন, আগামীকাল কী করবেন একেবারে দাবার চালের মতো সবকিছু জরিপ করতে লাগল বিদেশি গভর্নমেন্টগুলো। এর পেছনে রয়েছে ভারতের উত্থানে বিশ্বের বাজারে উন্নত দেশগুলোর কর্তৃত্ব হারানোর ভয়।

নরেন্দ্র মোদী একটু অফবিট। সবসময় গণ্ডির বাইরে গিয়ে চিন্তা ভাবনা করেন। 'আত্মনির্ভর ভারত' ও 'মেক ইন ইন্ডিয়া'র মাধ্যমে ভারতকে স্বনির্ভরতার দিশা দেখালেন। সম্পূর্ণ দেশীয় প্রযুক্তিতে দেশের বৈজ্ঞানিক ও শিল্পোদ্যোগীদের প্রচেষ্টায় তৈরি হলো কোভিশিল্ড ও কোভ্যাকসিন।

শুধু তাই নয়, প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রে সামরিক অস্ত্র আমদানিও কমিয়ে ফেলেছে ভারত। দেশেই তৈরি হচ্ছে অধিকাংশ যুদ্ধাস্ত্র ও সরঞ্জাম। ভারতের খেলনা বাজারে এতদিন চীনের রমরমা ছিল। মোদী সেখানেও মাথা ঘামালেন। চীনের খেলনা রপ্তানি মার খেলো। এতেই চীন, আমেরিকার মতো বিদেশি মুলুকের আঁতে ঘা লেগেছে। নরেন্দ্র মোদী যতদিন ভারতের প্রধানমন্ত্রী থাকবেন ভারত চলে যাবে তাদের ধরাছোঁয়ার বাইরে। অতএব প্রতিবন্ধকতা তৈরির চেষ্টা সেই থেকেই শুরু। কাশ্মীর থেকে ৩৭০ ও ৩৫-এ ধারা অবলুপ্তির পর পাকিস্তানের সঙ্গে একই সুরে গলা মিলিয়েছিল চীন ও আমেরিকা। কিন্তু নরেন্দ্র মোদীর ব্যক্তিত্বের সামনে সেই ধানাইপানাই ধোপে টেকেনি।

২০২১ সালে কৃষি সুরক্ষা নিয়ে তিনটে বিল আনতে চেয়েছিল মোদী সরকার। যার মধ্যে কৃষক সুরক্ষা ও ক্ষমতায়ন আইন (ফারমার্স এমপাওয়ারমেন্ট অ্যান্ড প্রোটেকশন অ্যাক্ট) ছিল। এই আইনের বিরোধিতায় আন্দোলন শুরু করল পঞ্জাবের তথাকথিত কৃষকরা। সরকার তার রদ করেছে। বিভিন্ন সূত্রে জানা গেছে, এই আন্দোলনে কোটি কোটি টাকা ইনভেস্ট করেছিল মার্কিন মুলুকের ডেমোক্রেটিক পার্টির হোমরাচোমড়ারা। ফাঁদ পেতেছিল সিআইএ। তাদের লক্ষ্য ছিল একটাই, ভারতে একটা অস্থিরতা তৈরি করে বিজেপি সরকারকে বিপাকে ফেলা। সরকার ভেঙে 'বিকাশ পুরুষ' নরেন্দ্র মোদীকে ভারতের ক্ষমতা থেকে সরানো। কিন্তু মোদী বিচক্ষণ মানুষ। তিনি জানেন লম্বা লাফ দিতে গেলে কখনো কখনো দু'পা পিছিয়ে আসতে হয়।

রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের সুযোগে যখন মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলো পেট্রোলিয়াম জ্বালানি ও তেলের দাম চড়া হারে বাড়িয়ে দিল, তখনও মোদী হাঁটলেন উলটো পথে। তুলনামূলক কম দামে রাশিয়া থেকে জ্বালানি আমদানির সিদ্ধান্ত নিলেন। তিনি ১৩০ কোটি ভারতীয়র স্বার্থরক্ষা সমুচিত ভেবেছেন। বাইডেনরা হাড়ে হাড়ে টের পেল নরেন্দ্র মোদীকে বাগে আনা এত সহজ নয়। এরই মধ্যে ফাঁস হলো মোদী হত্যার ষড়যন্ত্র। ইডি ও এনআইএ-র যৌথ অভিযানে ভারতের প্রধানমন্ত্রীকে হত্যার যাবতীয় পরিকল্পনা ভেস্তে গেল। বেশ কিছুদিন ধরেই পপুলার ফ্রন্ট অব ইন্ডিয়া নামে একটি হিট স্কোয়াডের নাম শোনা যাচ্ছিল। জঙ্গি কার্যকলাপের জন্য আর্মি ধাঁচের প্রশিক্ষণও দেওয়া হচ্ছিল পিএফআইয়ের সদস্যদের। সারা দেশ জুড়ে এই কার্যকলাপ চালাতে ও ছড়াতে যে প্রচুর অর্থের জোগান দরকার, তা বলাই বাহুল্য। সেই টাকা কোথা থেকে, কারা স্পনসর করেছে তা জানা যাবে। তবে মোদীর জন্য উপসাগরীয় অঞ্চলে যাদের তেলের ব্যবসা তলানিতে ঠেকার আশঙ্কা তাদের নাম উঠে আসলে অবাক হওয়ার কিছুই নেই।

বিশ্বের জ্বালানি বাজারে ওপেক গোষ্ঠীভুক্ত গালফ দেশগুলোর একচেটিয়া দাদাগিরি চলে আসছে বহু বছর ধরে। মধ্যপ্রাচ্যের এই সিন্ডিকেট ভাঙতে তৎপর হয়েছে ভারত। জীবাশ্ম জ্বালানির নির্ভরতা কমাতে বিকল্পের কথা ভাবছে নরেন্দ্র মোদীর সরকার। সেই লক্ষ্যেই ভারত গ্রিন হাইড্রোজেন প্রকল্পের প্রস্তাব এনেছে। এই প্রস্তাবে সমর্থন করা দেশগুলোকে নিয়ে ওপেকের মতো গ্রিন ফুয়েল গোষ্ঠী তৈরির পথে এগোচ্ছেন নরেন্দ্র মোদী। লক্ষ্য, ভারতকে গ্রিন এনার্জির হাব হিসেবে গড়ে তোলা। এই প্রকল্প কার্যকর হলে মধ্যপ্রাচ্য ও আমেরিকার দাদাগিরি শেষ হবে অচিরেই। ইতিমধ্যে বিল গেটস এক সাক্ষাৎকারে জানিয়েছেন আগামী ২০ বছরের মধ্যে গ্রিন এনার্জি সুপার পাওয়ারে পরিণত চলেছে ভারত।

ভারতীয় রুপির সঙ্গে মার্কিন ডলারের তালমিল কোনোকালেই ঠিকঠাক ছিল না। উপরন্তু সেই গোড়া থেকেই আমদানি-রপ্তানির ব্যবসায় ডলারকেই মাপকাঠি হিসেবে বেছে নেওয়া হয়েছিল। কোনোদিন শোনা যায়নি যে টাকা আর ডলারের দাম সমান হয়েছে। ডলারের অনুপাতে টাকার দাম চিরকালই কম। এই পরিস্থিতিতে নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বাধীন সরকার বিশ্ববাজারে ভারতীয় রুপির গুরু বাড়ানোর জন্য নতুন নীতি ঘোষণা করেছে। যার ফলে ভারত এখন থেকে ডলার নয়, টাকার অঙ্কেই আমদানি-রপ্তানি করবে। তার জন্য অধিক উৎপাদনশীল দেশ হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে চলেছে ভারত। যোগ্য হাতে দেশ থাকলে কী হতে পারে তার জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত আজকের নরেন্দ্র মোদীর ভারত। যে কারণে আন্তর্জাতিক সমীক্ষায় বারবারই বিশ্বের জনপ্রিয় রাষ্ট্রনায়ক হিসেবে উঠে আসে নরেন্দ্র মোদীর নাম। এখানেই আমেরিকা, চীন বা তাদের আশ্রিত দেশগুলোর গাত্রদাহ। যার প্রতিফলন বিভিন্ন সময়ে চোখে পড়ছে।

গত অক্টোবরে আমেরিকার অর্থনীতি বিষয়ক ম্যাগাজিন ওয়াল স্ট্রিট জার্নালে পাতা জোড়া একটি বিজ্ঞাপন হইচই ফেলে দেয়। সেখানে ভারতের কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামন-সহ ১১ জনের নাম দিয়ে শিরোনামে লেখা হয়েছে, 'Wanted Modi's Magnitsky 11'। কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী ছাড়া ইডি'র ডিরেক্টর সঞ্জয় কুমার মিশ্র, সলিসিটর জেনারেল তুষার মেহতা, সিবিআই-এর একাধিক কর্তা এবং একাধিক বিচারপতির নাম দিয়ে তাদের বিরুদ্ধে মানবাধিকার লঙ্ঘনের অভিযোগ তোলা হয়েছে। এই বিজ্ঞাপনের পিছনে রয়েছে আমেরিকার 'ফ্রন্টিয়ার অব ফ্রিডম' নামের একটি থিংক ট্যাংক। বিতর্কিত দেভাস সংস্থার কর্ণধার রামচন্দ্রণ বিশ্বনাথনও এই ষড়যন্ত্রে শামিল। ২০১১ সালে ভারতের ইসরোর সঙ্গে যৌথভাবে কাজ শুরু করে দেভাস। কিন্তু পরে রামচন্দ্রণের সংস্থার বিরুদ্ধে দুর্নীতির প্রমাণ পেয়ে সেই চুক্তি বাতিল হয়। সেই থেকেই নানাভাবে ভারতের ভাবমূর্তি নষ্ট করতে ময়দানে নেমেছে রামচন্দ্রণ। তার এই ক্ষোভকেই কাজে লাগিয়ে নরেন্দ্র মোদী ও ভারতের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের বীজ বুনছে ওয়ার্ল্ড পলিটিক্সের কেষ্ট-বিষ্টুরা। ওয়াল স্ট্রিট জার্নাল একটি বিশ্ববিখ্যাত প্রথম সারির পত্রিকা। সেখানে যে কেউ এসে ভারতের মতো একটা দেশের বিরুদ্ধে একটা বিজ্ঞাপন দিলেই ছেপে দেবে এতটা নির্বোধ তারা নয়। যদি না নির্দেশটা অনেক ওপর থেকে আসে। যেখানে দুই দেশের কূটনৈতিক সম্পর্কের সমীকরণও জড়িয়ে যায়। সঙ্গত কারণেই এখানে মার্কিন সরকারের যোগসাজশের সম্ভাবনা একেবারে উড়িয়ে দেওয়া যায় না।

এখানেই বোঝা যায় নরেন্দ্র মোদী ওয়ার্ল্ড পলিটিক্সে কতটা প্রভাবশালী। বিশ্বমঞ্চে ক্রমশ সুপার পাওয়ার হয়ে ওঠার দাবিদার হয়ে উঠছে ভারত। ভারতের অগ্রগতি বিশেষ করে নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে ভারতের উন্নয়ন বিশ্বের বহু দেশের কাছেই অস্বস্তির বিষয়। তাই আন্তর্জাতিক চক্র আদাজল খেয়ে নেমে পড়েছে নির্লজ্জভাবে মোদী বিরোধিতা করতে। ■

গুয়াহাটিতে প্রজ্ঞাপ্রবাহের লোকমন্থন-২০২২

গত ২১ থেকে ২৪ সেপ্টেম্বর প্রজ্ঞাপ্রবাহের উদ্যোগে অসমের গুয়াহাটি শহরের শ্রীমন্ত শঙ্করদেব কলাক্ষেত্রে লোক মন্থন-২০২২ আয়োজন করা হয়। ভারতীয় সংস্কৃতিভিত্তিক সর্বভারতীয় প্রবুদ্ধ মঞ্চ প্রজ্ঞাপ্রবাহের উদ্যোগে প্রতি দু'বছর অন্তর তিনদিনের একটি সম্মেলনের আয়োজন করা হয়ে থাকে। লোক মন্থন-২০২২ তারই একটি ক্রম। ২১ সেপ্টেম্বর বিকেলে প্রদীপ প্রজ্বলনের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সূচনা হয়। উপস্থিত ছিলেন অসম সরকারের মন্ত্রী বিমল বোরা, মণিপুরের মহারাজা তথা রাজ্যসভার সদস্য লেইশেমরা সানাজাওরা, রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের অসম ক্ষেত্র বৌদ্ধিক প্রমুখ তীর্থাঙ্ক দাস কলিতা।

২২ সেপ্টেম্বর পঞ্জীকরণের পর শুরু হয় উদ্বোধনী অনুষ্ঠান। উপস্থিত ছিলেন উপরাষ্ট্রপতি জগদীপ ধনখড়, অসম ও নাগাল্যান্ডের রাজ্যপাল জগদীশ মুখী, অসমের মুখ্যমন্ত্রী ড. হিমন্ত বিশ্বশর্মা এবং প্রজ্ঞাপ্রবাহের রাষ্ট্রীয় সংযোজক জে নন্দকুমার। অনুষ্ঠানে সারা দেশ থেকে পাঁচহাজার কার্যকর্তা অংশগ্রহণ করেন। দক্ষিণবঙ্গের ৫৫ জন, মধ্যবঙ্গের ৪৬ জন এবং উত্তরবঙ্গের ২০ জন প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন। ভারতীয় সংস্কৃতির প্রদর্শনী এবং সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। পশ্চিমবঙ্গ লোকপ্রজ্ঞার পক্ষ থেকেও একটি প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়। উপস্থিত ছিলেন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের সরকার্যবাহ দত্তাত্রেয় হোসবলে এবং কেরালার রাজ্যপাল আরিফ মহম্মদ খান। তাঁদের প্রেরণাদায়ী বক্তব্য সকলকে সমৃদ্ধ করেছে। সম্পূর্ণ অনুষ্ঠানের নেপথ্যে থেকে পরিচালনা করেছেন সহ সরকার্যবাহ ড. মনমোহন বৈদ্য। পূর্ণ রাষ্ট্রগীতের পর অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা হয়।

ভারতীয় কিষাণ সঙ্ঘের 'ভারতীয় কিষাণ বার্তা'র প্রকাশ অনুষ্ঠান

গত ৬ অক্টোবর কলকাতার মানিকতলা স্থিত কেশব ভবনে ভারতীয় কিষাণ সঙ্ঘের পশ্চিমবঙ্গ শাখার কৃষি পত্রিকা ভারতীয় কিষাণ বার্তার পঞ্চম সংখ্যার আনুষ্ঠানিক প্রকাশ করা হয়।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ভারতীয় কিষাণ সঙ্ঘের অখিল ভারতীয় কার্যকারিণীর সদস্য তথা পশ্চিমবঙ্গ শাখার সভাপতি কল্যাণ কুমার মণ্ডল, রাজ্য সাধারণ সম্পাদক অনিমেষ পাহাড়ি, প্রান্ত সংগঠন সম্পাদক অনিল চন্দ্র রায়, পূর্বক্ষেত্র ও উত্তর-পূর্বক্ষেত্রের সংগঠন সম্পাদক শ্রীনিবাস, প্রান্ত প্রচার প্রমুখ ড. কল্যাণ জানা এবং রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের দক্ষিণবঙ্গ প্রান্ত প্রচারক প্রশান্ত ভট্ট।

ক্ষেত্রীয় ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় রায়গঞ্জ সারদা বিদ্যামন্দিরের অভাবনীয় সাফল্য

শুধু লেখাপড়াই নয়, সর্বদিক থেকে বিকশিত হয়ে উঠছে রায়গঞ্জ সারদা বিদ্যামন্দিরের (ইংরেজি মাধ্যম) বিদ্যার্থীরা। খেলাধুলায়ও অভাবনীয় সাফল্য অর্জন করেছে এই বিদ্যালয়ের পড়ুয়ারা। গত ১৩ -১৪ অক্টোবর ওড়িশার জাজপুরে সরস্বতী শিশুমন্দিরে অনুষ্ঠিত ক্ষেত্রীয় পর্যায়ের ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় এই বিদ্যালয়ের ৬ জন শিক্ষার্থী অ্যাথলেটিকের ১৫টি ইভেন্টে অংশগ্রহণ করে ১৫টিতেই পুরস্কৃত হয়েছে। এরা ১৪টিতে প্রথম স্থান এবং ১টিতে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে বিদ্যালয়ের মুখ উজ্জ্বল করেছে। ছাত্রীদের মধ্যে মানসী সিংহ ও প্রতিষ্ঠা ঝা এবং ছাত্রদের মধ্যে স্বপ্নদীপ সিংহরায়, বিশ্বরূপ মণ্ডল, সায়ন রায় ও

দীপাঞ্জন সরকার প্রতিনিধিত্ব করে।

ক্ষেত্রীয় ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় অভাবনীয় সাফল্যের জন্য গত ১৬ অক্টোবর বিদ্যামন্দিরের পক্ষ থেকে পড়ুয়াদের সংবর্ধনা দেওয়া হয়। প্রধান আচার্য রাজবলী পাল এদের অভিনন্দন জানান এবং জাতীয় স্তরে সাফল্যের জন্য উৎসাহ প্রদান করেন। উল্লেখ্য, বিদ্যামন্দিরের শারীরিক বিভাগের আচার্য তপন দাস ও আচার্যা শ্রীমতী সুষমা মাহাত শিক্ষার্থীদের অনুশীলনে সদা তৎপর রয়েছেন। ছাত্র-ছাত্রীদের এই সাফল্যে বিদ্যালয় মহলে খুশির পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে।

জুগল কিশোর জৈথলিয়া স্মৃতি ব্যাখ্যানমালা

'চ্যালেঞ্জের মোকাবিলা সৈনিকের মতো দৃঢ়ভাবে করতে হয়। পূর্বপুরুষদের স্মৃতি অক্ষুণ্ণ রাখা আমাদের ধর্ম। আত্মবিস্মৃত জাতির না থাকে বর্তমান , না থাকে ভবিষ্যৎ। পরাজয়ের নয়, আমাদের গৌরব ও বিজয়ের ইতিহাস প্রয়োজন। আজ যাদের বেশি লম্ফঝম্প ও মুখর হতে দেখা যাচ্ছে, তা আসলে তাদের নেতিবাচক চিন্তাধারা জনিত মনের জ্বালা ও ক্রন্দন মাত্র। স্বাধীনতার অমৃত মহোৎসব নতুন ভারতের উদয় উৎসব। ভারতবাসী শীঘ্রই নতুন ভারতের স্বর্ণিম ভাগ্যোদয় দর্শন করবে। রাষ্ট্রভক্তির সঙ্গে কোনোরকম আপোশ করা যেতে পারে না। কর্মযোগী জৈথলিয়াজীর স্মরণের অর্থ হলো আমাদের অস্মিতার স্মরণ।' গত ৯ অক্টোবর বড়বাজার কুমারসভা পুস্তকালয়ের উদ্যোগে স্থানীয় রথীন্দ্র মঞ্চে আয়োজিত জুগল কিশোর স্মৃতি ব্যাখ্যানমালায় 'স্বাধীনতার অমৃত মহোৎসব এবং নতুন ভারতের সামনে চ্যালেঞ্জ' শীর্ষক বক্তৃতায় কথাগুলি বলেন প্রখ্যাত চিন্তক এবং পাঞ্চজন্য

সাপ্তাহিকের পূর্বতন সম্পাদক শ্রীতরুণ বিজয়। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন বনবন্ধু পরিষদের রাষ্ট্রীয় অধ্যক্ষ রমেশ সারাওগী। প্রধান অতিথি রূপে উপস্থিত ছিলেন রবীন্দ্র ভারতী সোসাইটির মহাসচিব সিদ্ধার্থ মুখোপাধ্যায়। অনুষ্ঠানের শুরুতে রবীন্দ্র ভারতী সোসাইটির সদস্যরা উদ্বোধনী সংগীত পরিবেশন করেন। সম্মাননীয় অতিথিদের মাল্যার্পণ করে স্বাগত জানান রামচন্দ্র অগ্রওয়াল, অজয় চৌবে ও সত্যপ্রকাশ রায়। এছাড়াও মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন পুস্তকালয়ের অর্থমন্ত্রী অরুণ মল্লাবত এবং সাহিত্যমন্ত্রী যোগেশরাজ উপাধ্যায়। প্রাস্তাবিক বক্তব্য রাখেন পুস্তকালয়ের সম্পাদক বংশীধর শর্মা। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন পুস্তকালয়ের অধ্যক্ষ মহাবীর বজাজ এবং ধন্যবাদ জানান উপাধ্যক্ষ ভাগীরথ চাণ্ডক। অনুষ্ঠানে বিভিন্ন ক্ষেত্র থেকে বহু গণ্যমান্য ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন। সক্রিয় সহযোগিতা করেছেন নন্দকুমার লঢ়া, মনোজ কাকড়া, রাজারাম বিহানী, গোবিন্দ জৈথলিয়া, শ্রীমোহন তিওয়ারী, রমাকান্ত সিনহা, বৃজেন্দ্র পটেল।

গাজোলে উত্তরের সংস্কার ভারতীর বিজয়া সম্মেলন

গত ২১ অক্টোবর মালদা জেলার গাজোল শান্তি লজে উত্তরের সংস্কার ভারতীর বিজয়া সম্মেলন ও জেলা বৈঠকের আয়োজন করা হয়। উপস্থিত ছিলেন উত্তরের সংস্কার ভারতীর উত্তরবঙ্গ প্রান্ত সভাপতি সঞ্জয় কুমার নন্দী, সহ সভাপতি জহর কুণ্ডু, জেলা সভাপতি পরেশ চন্দ্র সরকার জেলা সম্পাদক তথা প্রান্ত কোষাধ্যক্ষ কিশোর সরকার, সহ সম্পাদক রাজু মণ্ডল ও শ্রীমতী রুমা দে। প্রান্ত সভাপতি প্রদীপ প্রজ্বলন করে অনুষ্ঠানের শুভারম্ভ করেন। এরপর সজল দত্তের নেতৃত্বে সমবেত কণ্ঠে সংগঠনের

ভাবসংগীত পরিবেশিত হয়। প্রাস্তাবিক ভাষণ রাখেন জেলা সভাপতি পরেশ চন্দ্র সরকার। সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে স্বরচিত কবিতা আবৃত্তি করেন গাজোল চর্চাকেন্দ্রের সংযোজক অশোক মজুমদার। আবৃত্তি করেন নেহা রায়, প্রেয়সী বর্মন ও অশোক রায়। সংগীত পরিবেশন করেন পল্লবী ঘোষ, সুপ্রিয় মজুমদার, মালদহ চর্চাকেন্দ্রের সজল দত্ত, তনুশ্রী চৌধুরী, অনুশ্রী সরকার, সুস্মিতা ভট্টাচার্য, কাকলি বিশ্বাস ও তন্দ্রা পাল। বক্তব্য রাখেন জেলা সম্পাদক কিশোর সরকার। এরপর প্রশ্নোত্তরের কালাংশ। জেলা বৈঠকে শ্যামল কুণ্ডুকে জেলা নাট্য প্রমুখ, সঞ্জীব সরকারকে সাহিত্যবিধা প্রমুখ হিসেবে ঘোষণা করা হয়।

সদস্য হিসেবে মনোনীত হন পঞ্চানন মাহাত, মহেশ সিংহ ও মিঠুন সাহা। সমাপ্তি বক্তব্য রাখেন প্রান্ত সভাপতি সঞ্জয় নন্দী। সমগ্র অনুষ্ঠান সুচারুরূপে পরিচালনা করেন সঞ্জীব কুমার সরকার। রাষ্ট্র বন্দনার পর অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়। এদিনের বিশেষ আকর্ষণ ছিল গাজোল চর্চাকেন্দ্রের সংগীত বিধা প্রমুখ তথা শিলিগুড়ি বেতার শিল্পী বলাই রায়ের কণ্ঠে সংগীত পরিবেশন। তবলায় ছিলেন কিশোর সরকার এবং ঢোলকে বিট্টু মণ্ডল।

স্বামীজীর শিকাগো বক্তৃতা দিবস উপলক্ষ্যে বেহালায় অনুষ্ঠান

স্বামী বিবেকানন্দের ১২৯তম শিকাগো বক্তৃতা দিবস উপলক্ষ্যে গত ১১ সেপ্টেম্বর বেহালা বিবেকানন্দ পাঠচক্রের উদ্যোগে পর্ণশ্রী পার্কে স্বামীজীর মর্মর মূর্তির সামনে এক মনোজ্ঞ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। স্বামীজীর মূর্তিতে মাল্যদান ও 'বিপ্লবী বীর বিবেকানন্দ' গানের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের শুভারম্ভ হয়। গানটি পরিবেশন করেন বিবেকানন্দ পাঠচক্রের সদস্য সাগ্নিক বন্দ্যোপাধ্যায়। স্বামীজীর শিকোগো বক্তৃতার বাংলা অনুবাদ খুব সুন্দরভাবে পাঠ করেন পাঠচক্রের সম্পাদক সুপ্রিয় বন্দ্যোপাধ্যায়। শিকাগো বক্তৃতার মাধ্যমে কীভাবে বিশ্ব তথা ভারতবর্ষের মানুষের কাছে ভারতীয় আদর্শ ছড়িয়ে পড়েছিল তা তাঁর বক্তব্যে ফুটে ওঠে। পাঠচক্রের সভাপতি স্বপন কুমার ঘোষ সভাপতির ভাষণে পাঠচক্র ১৯৬৭ সাল থেকে স্বামীজীর আদর্শ নিয়ে এখন পর্যন্ত কীভাবে কাজ করে চলেছে তা খুব সুন্দরভাবে সকলের সামনে তুলে ধরেন। পার্কে উপস্থিত সকলেই এই অনুষ্ঠানের অংশ হয়ে ওঠেন।

ধর্ম বিশ্বজনীন উপলব্ধি

নন্দলাল ভট্টাচার্য

মহাজনের পথই পথ

নানা কারণেই ভারত-ধর্ম অনন্য। শাশ্বত— সনাতন এই ধর্ম। সেই ধর্মের স্বরূপ বোঝার আগে শোনা যাক বরং একটি গল্প। গল্প না বলে ঘটনা বলাই ভালো। সেই ঘটনার সূত্রেই আভাস পাওয়া যাবে সনাতন ধর্মের, সাধারণ ভাবে যার পরিচিতি আজ হিন্দুধর্ম হিসেবে।

তখনও হয়নি কুরুক্ষেত্র মহারণ। তবে শুরু হয়ে গেছে তার মঞ্চ সজ্জার কাজ। শর্ত অনুযায়ী পাণ্ডবরা বনবাসী। রাজধানী ছেড়ে তাঁরা তখন বাসা বেঁধেছেন কাম্যক বনে। সব দিক থেকে রমণীয় সেই বনেই দ্রৌপদীকে নিয়ে পঞ্চপাণ্ডব রয়েছেন সুদিনের অপেক্ষায়।

তারই মধ্যে ঘটল অঘটন। পুরোহিত ধৌম্য ও দ্রৌপদীকে কুটিরে রেখে পঞ্চপাণ্ডব বেরিয়েছেন মৃগয়ায়। সখ মেটাতে নয়, বেঁচে থাকার রসদ জোগাড় করতেই তাঁদের এই শিকার অভিযান। কুটির-অঙ্গনে বিমনা দ্রৌপদী বসে আছেন পঞ্চপাণ্ডবের অপেক্ষায়।

রোজই বসে থাকেন তিনি ওইভাবে। অলস সময় কাটে তাঁর অতীত ও ভবিষ্যতের নানা ভাবনায়। নিরাপদ নির্জন সেই বনে স্বভাব- নিঃশঙ্ক দ্রৌপদী সেদিনও ডুবে আছেন নিত্যদিনের ভাবনার গভীরে। হঠাৎ সচকিত বন বহুজনের কোলাহলে। ধৃতরাষ্ট্র-নন্দিনী দুঃশলার স্বামী সৌবীর তথা সিন্ধুরাজ জয়দ্রথ আরেকটি বিয়ে করে সদলবলে ফিরছেন ওই বন পথে। তাই ওই কলরব। আপন চিন্তায় মগ্ন দ্রৌপদীর কাছে কিন্তু অশ্রুতই থেকে যায় সব শব্দ। তিনি বসে আছেন একই ভাবে। যেন পটে আঁকা ছবি। তাঁকে দেখেই জয়দ্রথ চঞ্চল। পরিণতির কথা না ভেবেই হরণ করেন তিনি দ্রৌপদীকে।

মৃগয়া শেষে কুটিরে ফিরে পাণ্ডবরা শোনেন সব। তিলেক বিলম্ব না করে তাড়া করেন জয়দ্রথকে। চিতার গতিতে ছুটে তাঁরা ধরে ফেলেন তাকে। মুহূর্তে বিধ্বস্ত জয়দ্রথের সঙ্গী-বাহিনী। নানা ভাবে জয়দ্রথকে লাঞ্ছিত করে উদ্ধার করেন তাঁরা দ্রৌপদীকে। যুধিষ্ঠিরের অনুকম্পায় প্রাণে বাঁচেন জয়দ্রথ। তার জন্য কৃতজ্ঞতা নয়, বরং এক মারণ-তপস্যায় বসেন তিনি। সে অবশ্য ভিন্ন কাহিনি।

সেদিনের ওই ঘটনার পর কাম্যকবন ছেড়ে পাণ্ডবরা এবার দ্বৈত বনবাসী।

সেখানে বেশ ভালোই ছিলেন তাঁরা। কিন্তু নিয়তির পাশার দানে আবার বিপর্যয়। এক ব্রাহ্মণের অরণি নিয়ে পালায় একটি মায়া-মৃগ। ব্রাহ্মণ সাহায্য চান পাণ্ডবদের। পাণ্ডবরাও সঙ্গে সঙ্গে বেরিয়ে পড়েন সেই মৃগের সন্ধানে।

বনের গভীরে উধাও সেই মৃগ। ওদিকে বহুক্ষণের ছোটাছুটিতে পাণ্ডবরা ক্লান্ত, তৃষ্ণার্ত। যুধিষ্ঠিরের নির্দেশে নকুল যান দূর সরোবরে জল আনতে।

সরোবরে নামার মুহূর্তে অলক্ষ্যে ধ্বনিত এক বাণী— সাবধান! আগেই অধিকার করেছি এই সরোবর আমি। আমার প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে জলে নামলেই জীবন যাবে তোমার।

সে কথায় কান না দিয়ে জলপান করার মুহূর্তেই বিগতপ্রাণ নকুল।

কাটে সময়। নকুলের দেরি দেখে যুধিষ্ঠির আবার পাঠান সহদেবকে। কিন্তু ঘটে সেই একই ঘটনা। এরপর একে একে আসেন ভীম ও অর্জুন। তাঁরাও কান দেন না সেই আকাশবাণীতে। ফল হয় একই।

অবশেষে আসেন যুধিষ্ঠির। শোনেন সেই একই কথা। থমকে দাঁড়ান তিনি। বোঝেন অদৃশ্য এই বক্তা মহা শক্তিধর। মানুষ তিনি নন অবশ্যই। হয়তো কোনো দেবতা বা যক্ষ। তাই সবিনয়ে বলেন, দেখা দিন আপনি। চেষ্টা করব আমি আপনার প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার।

এহেন প্রতিশ্রুতিতে প্রকট হন যক্ষ। শুরু হয় এক ধরনের সওয়াল জবাব। প্রশ্নকর্তা যক্ষ, উত্তরদাতা যুধিষ্ঠির। প্রশ্নের পর প্রশ্ন। যেন ঘনবর্ষার বাদল ধারা। উত্তরে খুশি যক্ষ। তাই জটিল থেকে জটিলতর বিষয়ের অবতারণা। সেই সূত্রেই জিজ্ঞাসা, প্রধান ধর্ম কী? কোন ধর্ম ফল দেয় সকল সময়ই?

এক কথায় যুধিষ্ঠিরের উত্তর, আমৃশংস্য অর্থাৎ অ-হিংস্রতার প্রধান ধর্ম। বৈদিক ধর্মই ফল দেয় সকল সময়।

এরই রেশ ধরে আবারও প্রশ্ন। যুধিষ্ঠিরও উত্তর দেন বিশদে। বলেন, তর্কের কোনো শেষ নেই। বেদ ও স্মৃতিও নানা রকম। সর্বত্রই নানা মুনির নানা মত। সোজা কথায়, ধর্মের তত্ত্ব অত্যন্ত গূঢ়। জ্ঞান-গুহায় বিলীন রয়েছে তা, এ কারণেই সেই ধর্ম বা তত্ত্বের সন্ধানে মহাজনের পথই পথ, যেতে হবে সেই পথেই।

যুধিষ্ঠিরের কথা যেন কঠোপনিষদের বাণীরই প্রতিধ্বনি— 'ক্ষুরস্য ধারা নিশিতা দুরত্যয়া দুর্গং পথস্তৎ কবয়ো বদন্তি' (১।৩।১৪)— তীক্ষ্ণ শাণিত ক্ষুরের অগ্রভাগের ওপর হাঁটা প্রায় অসম্ভব। একই রকম হলো আত্মজ্ঞান বা ধর্মলাভের পথও, এক্ষেত্রে বিবেকবানদের কথা বা পথই— পথ।

যুধিষ্ঠিরের উত্তরে তুষ্ট যক্ষ প্রকাশিত হন স্বরূপে। বলেন, আমি ধর্ম। তোমাকে পরীক্ষা করার জন্যই এই নাটক। উত্তীর্ণ তুমি এ পরীক্ষায়।

এবার যবনিকা পতন। তবু শেষ হয় না নাটক। বরং আবার আরও এক নাটকের অবতারণা।

স্বার্থবুদ্ধির নেই স্থান

আবার জিজ্ঞাসা ধর্মের। তবে এ এক অন্য পরীক্ষা। তাঁর কথা, যুধিষ্ঠির, তোমার উত্তরে খুবই খুশি হয়েছি আমি। তুমি এবার নির্দ্বিধায় পান করতে পারো এই সরোবরের জল। আর সেই সঙ্গে ফিরে পেতে পারো চার পাণ্ডবদের মধ্যে আরও একজনের প্রাণ। বলো, কাকে চাও তুমি? আমি পূর্ণ করবো তোমার সেই প্রার্থনা।

মুহূর্তের ভাবনা। পঞ্চ পাণ্ডবের মধ্যে নকুল আর সহদেব মাদ্রীতনয় আর তাঁরা তিনজন কুন্তীর সন্তান। তাই স্বাভাবিক স্বার্থ বুদ্ধিতে ভীম অথবা অর্জুনের প্রাণ ভিক্ষা চাওয়াটাই হতো সঙ্গত। কিন্তু যুধিষ্ঠিরের ভাবনা বইল অন্য খাতে। তাঁর বিচার, কুন্তীর সন্তান হিসেবে তিনি তো রইলেনই। এখন যদি ভীম বা অর্জুনের প্রাণ চান তাহলে তো মাতা মাদ্রীর কোনো সন্তানই থাকবে না। তাই ভীম বা অর্জুন মহাবীর এবং একই মায়ের সন্তান হওয়া সত্ত্বেও তিনি প্রাণ চাইলেন নকুল সহদেবের মধ্যে যে কোনো একজনের।

কেন এই সিদ্ধান্ত? ধর্মের প্রশ্নের উত্তরে যুধিষ্ঠির জানান তাঁর বিবেচনার কথা। সে কথায় পরম তুষ্ট স্বয়ং ধর্ম। আত্মপরায়ণতা বা সংকীর্ণ স্বার্থ বুদ্ধি নয়, বিশ্বজনীনতাই ভারত ধর্ম। বসুধৈব কুটুম্বকম্ তার জীবন বেদ। সেই বৈদিক পথ-যাত্রী যুধিষ্ঠিরের এহেন সিদ্ধান্তের জন্য প্রাণভরে তাঁকে আশীর্বাদ করেন ধর্ম। যাবার আগে সানন্দেই জীবন ফিরিয়ে দেন চার পাণ্ডবেরই। ফিরে যান পাঁচ ভাই আবার কুটিরে।

ধর্ম ও রিলিজিয়ন ভিন্ন বস্তু

বস্তুত, যক্ষ-যুধিষ্ঠিরের এই সংলাপের মধ্যেই লুকিয়ে আছে ভারত-ধর্মের প্রকৃত স্বরূপটি। স্বার্থবোধ বিসর্জন দিয়ে আত্মবোধে উত্তরণ এবং সত্য ও পরম্পরার পথে অগ্রগমনই এই ধর্মের মর্মকথা।

ধর্ম বিশ্বজনীন, তার সত্য ও লক্ষ্যও এক। তা সত্ত্বেও যুধিষ্ঠির কথিত নানা মুনির নানা মতের মতোই বিশ্বে রয়েছে নানা ধর্ম। একটু নিবিষ্ট হলেই অনুভব করা যাবে— এ সবই হলো এক একটি সম্প্রদায়ের ধর্ম। এক এক মুনির এক এক মতবাদকে আশ্রয় করে গড়ে উঠেছে বিশ্বের এক একটি ধর্মমতের অবয়ব। দ্বেষ-শূন্যতা এবং মানবপ্রেমের কথাই বলে সব ধর্ম। কিন্তু বলার ধরন এবং স্ব-সম্প্রদায়ের নানা আচার-আচরণ থেকেই জন্ম নেয় এক ধরনের অসহিষ্ণুতা। এক ধরনের আগ্রাসী মনোভাবের। আর সে কারণেই ধর্মের প্রকৃত লক্ষ্য ছেড়ে উপলক্ষ্য নিয়েই চারিদিকে মাতামাতি। আর তাতে সকলের আগে বলি হচ্ছে নিজেদের আচরিত ধর্মই। আপনার মহাসাগরের জলরাশি ছেড়ে সামান্য কূপে আশ্রয় নেওয়ার মতোই আজকের আচরিত ধর্মগুলি হয়ে উঠেছে কূপমণ্ডুক। উদার উন্মুক্ত সুনীল আকাশের পরিবর্তে বিবরের ঘনান্ধকার থেকে এক টুকরো আকাশ দেখার মধ্য দিয়ে বৃথা আস্ফালনে

ব্যস্ত বিভিন্ন ধর্মের অনুগামীরা। তারই ফলে ধর্মের প্রকৃত সংজ্ঞাটাই বদলে যাচ্ছে ক্রমে।

এই ধারায় সনাতন শাশ্বত ধর্ম তথা হিন্দু ধর্মের বৈশিষ্ট্য নিয়ে আলোচনার আগে তাই ধর্ম কাকে বলে সে সম্পর্কে মহাজনদের নানা কথা নিয়ে কিছু কথা বলাটা একদিক থেকে খুবই জরুরি হয়ে উঠেছে, বিশেষ করে বর্তমানের প্রেক্ষিতে।

স্বাধীনতার এই পঁচাত্তর বছরে দাঁড়িয়ে একটা উপলব্ধি আজ বহু মানুষকেই তাড়া করছে। রাজনৈতিক স্বাধীনতা পেলেও তার প্রায় তিনশো বছরে আমাদের মননের জগতে ঘটে গেছে একটি বিপর্যয়। একথা সত্য, পাশ্চাত্য শিক্ষা প্রবর্তনের পর তার জ্ঞানের অনেক নতুন দুয়ার খুলে গেছে আমাদের সামনের কিন্তু চিন্তনের ক্ষেত্রে দেখা দিয়েছে মহাসংকট। বহু ক্ষেত্রেই ইংরেজি শব্দের বাংলা করে আমরা সবকিছু ভাবতে শুরু করেছি। আর তাতে অনেক সময়ই নিজেকে অথবা নিজেদের জানার ক্ষেত্রে থেকে যাচ্ছে একটা ফাঁক। এবং সেই ফোকর দিয়েই হারিয়ে যাচ্ছে আত্মরূপ অনুভবের মানসিকতা।

যেমন ধরা যাক ধর্মের কথা। ধর্ম একটি সংস্কৃত শব্দ। ধৃ-ধাতু থেকে তার উৎপত্তি। অর্থ যার, ধারণ করা, এবং সেটা সামগ্রিকভাবে সমগ্র এই বিশ্বজগৎ অথবা যাকে বলা হয় ব্রহ্মাণ্ড— তার ক্ষেত্রেও সমানভাবে প্রযোজ্য। সে অর্থে ধর্ম হচ্ছে কিছু কর্তব্য, কিছু দায়দায়িত্ব, কিছু নৈতিক বোধ, সমাজ শাসনের কিছু নিয়ম নীতি, কিছু আচরণীয় কৃত্য।

কিন্তু যে সময় থেকে ইংরেজি 'রিলিজিয়ন' শব্দটির বাংলা করা হলো ধর্ম, গোল বাঁধল তখন থেকে। মনে রাখা দরকার, রিলিজিয়ন হলো একটি কেন্দ্রীয় বিশ্বাস আর ধর্ম হলো একটি বিশ্বজনীন উপলব্ধি। রিলিজিয়নের কেন্দ্রে রয়েছে কোনো মহামানব বা অবতার পুরুষ নির্দেশিত কিছু বিধান। রিলিজিয়ন হলো একটি গোষ্ঠী বা সম্প্রদায়ের বিষয়। তার চেয়েও বড়ো কথা, রিলিজিয়ন হলো কেবলই মানুষের জন্য। অন্য কোনো প্রাণী অথবা সৃষ্টির আর কিছুর সঙ্গে তার কোনো সম্পর্ক নেই। রিলিজিয়ন মানুষ ছাড়া আর অন্য কিছু নিয়ে ভাবে না।

ধর্ম যেন আকাশ

কিন্তু ধর্ম হলো আকাশের মতো উদার উন্মুক্ত এক চেতনা— যার যোগ এই সৃষ্টির সব কিছুর সঙ্গে। কেবল মানুষ নয়, সমস্ত প্রাণী, বৃক্ষলতা, পাহাড় পর্বত, সূর্য-তারা সবকিছু নিয়েই ধর্মের জগৎ। মহাবিশ্বের সবকিছুর উন্নতি, কল্যাণ ও অগ্রগতির কথা রয়েছে ধর্মের মধ্যে। এই সার্বিক বোধেরই প্রতিফলন ভারত-ধর্মে প্রতিভাত। তাই তো তর্পণের মন্ত্রে ভারত বলে,— 'আব্রহ্মস্তস্ব পর্যন্তং জগৎ তৃপ্যতু'— বলে—

দূর সে অতীতে
সপ্তদ্বীপে— সপ্তস্বরে
মন্দ্রিত যাঁদের কণ্ঠ—
জীবনের জয়গানে—
সত্তায় প্রস্থিত তাঁরা
অনন্ত আলোক-সাগরে।
তাঁহাদেরই স্মরি উদক তর্পণে
শ্রদ্ধায় বিগত প্রাণ
অচ্ছেদ্য এক টানে।
অন্তরে বর্ণিত নিত্য-সুভাষণে
তৃপ্ত হও— তৃপ্ত হও
তৃপ্ত করো— অখিল উত্তর জনে।

রিলিজিয়ন শুধু মানুষের

ধর্মবেত্তা ও ধর্মশাস্ত্রবিদরা মনে করেন, ধর্ম হচ্ছে ভারতীয় মনীষার এক অপূর্ব উপলব্ধি। এই উপলব্ধি মানুষ, তাকে ঘিরে গড়ে ওঠা সভ্যতা এবং সামগ্রিক ভাবে এই বিশ্বজগৎকে কেন্দ্র করে।

তাঁদের মতে ধর্ম ও রিলিজিয়নের কোনো বর্গীয়করণ বা অনুবাদ হতে পারে না। কেননা এই বোধের উৎপত্তি সম্পূর্ণ ভিন্ন সংস্কৃতি থেকে। রিলিজিয়ন সম্পর্কে ধারণা গড়ে ওঠে ষোড়শ শতকে ক্যাথলিক মিশনারিদের চিন্তাভাবনা থেকে। তাঁরা মনে করতেন রিলিজিয়নের উদ্ভব একটি সম্প্রদায়ের সুসংবদ্ধ বিশ্বাস থেকে।

অন্যদিকে ধর্ম হচ্ছে একটি ভারতীয় ভাবনা। ধর্মে কোনো ভেদাভেদ নেই, আছে ঐক্য। ধর্ম হলো সকলের আর রিলিজিয়ন হলো একটি গোষ্ঠী বা জাতির সংগঠিত বিশ্বাস, আচার-আচরণ এবং একটি প্রণালী বা পদ্ধতি। যে পদ্ধতিতে বেশিরভাগ সময়ই সব কিছুর নিয়ন্ত্রক শক্তি হিসেবে করা হয় ঈশ্বরের উপাসনা, আরাধনা। যেখানে ঈশ্বরভাবনা নেই সেখানে আছে কোনো অতিপ্রাকৃত শক্তির ভজনা।

রিলিজিয়নের ক্ষেত্রে সৎ-অসৎ, প্রাকৃতিক ও অপ্রাকৃতিক এমনকী মানব ও মানবেতর প্রাণীর মধ্যেও ভেদ রয়েছে। অন্যদিকে ধর্মের মধ্যে কিন্তু এই ভেদাভেদ নেই। আর ওই কারণেই বুধমণ্ডলীর দৃষ্টিতে ধর্ম হলো একটি অনন্য বিশ্বজনীন বোধ। অর্থাৎ বিশ্বপূর্ণতাই হলো ধর্মের বৈশিষ্ট্য।

ধর্ম হলো অবিনশ্বর। সময়ের সঙ্গে তার মূল বিষয়গুলি বদলায় না। পরাশর স্মৃতির ভাষ্যকার মাধবাচার্যের মতে, ধর্মই ইহজগতের প্রগতি এবং কল্যাণ ও উন্নয়নের মূল শক্তি। অন্যদিকে ধর্মই পরলোকে অমৃতের সন্ধান দেয়। ইতি ও নেতিবাচক দুই অর্থেই ধর্ম কিছু বিধি ও নির্দেশ দেয়।

ধর্মের কথা বলতে গিয়েই বলা হয়েছে, আত্মজিজ্ঞাসা থেকে আসে ধর্মজিজ্ঞাসা। ঐহিক বা পার্থিব সুখে মানুষের পূর্ণ সন্তোষ আসে না। সব পাওয়ার পরও ওঠে প্রশ্ন, এই পার্থিব জীবনের পরেও আছে কোনো জগৎ? আছে কি চিরন্তন আনন্দের অস্তিত্ব? এই প্রশ্নকেই মহর্ষি জৈমিনি বলেছেন ধর্মজিজ্ঞাসা। হিন্দুধর্মে অধ্যাত্ম সাধকের এটাই হলো প্রথম সোপান। □

ইতিহাসে ধলঘাটের যুদ্ধ হলদিঘাটের মতোই মহিমাময়

দীপক খাঁ

ধ্বনিগত মিল পাওয়া যায় হলদিঘাট ও ধলঘাটের মধ্যে, কিন্তু গভীরে প্রবেশ করলে আরও মিল পাওয়া যাবে যদি একটু অতীতের দিকে দৃষ্টি ফেরানো যায়। উভয় স্থানের যুদ্ধ চেহারায় ও ব্যাপ্তিতে আলাদা। হলদিঘাটে যুদ্ধ করেছিলেন মহারাণা প্রতাপ সিংহ স্বাধীন মেবারের গৌরব রক্ষার্থে। আর ধলঘাটের যুদ্ধ করেছেন পরাধীন দেশের বিপ্লবী সূর্য সেন স্বাধীনতাকে বগলদাবা করে ফিরিয়ে আনার দুর্জয় আকাঙ্ক্ষায়। হলদিঘাট যুদ্ধ রাজপুত বিক্রমের বিস্তৃত প্রকাশ আর ধলঘাট বাঙ্গালির শৌর্যের দুঃসহ অভিব্যক্তি। মহারাণা প্রতাপ ও তার সহযোগীদের যে দেশপ্রেম, বীর্য ও প্রত্যয় ইতিহাস প্রখ্যাত হয়ে আছে, সেই একই দেশপ্রেম-নিষ্ঠা-বীর্য ও প্রত্যয়ই সূর্যসেন ও তাঁর সতীর্থদের মধ্যে বিরাজিত। কাজেই আদর্শে ও আত্মদানে উভয় যুদ্ধস্থলে ছন্দগত মিলটিও অপূর্ব।

ধলঘাটের আস্তানাটি ভালোই জুটেছিল ইন্ডিয়ান রিপাব্লিকান আর্মির গোপন হেডকোয়ার্টার হিসাবে। দুর্দিনে সমস্ত চট্টগ্রামের বিপ্লবী সংস্থাটি পরিচালিত হচ্ছে ওই আশ্রয়কেন্দ্র থেকে, ক্রিয়াকর্মের নির্দেশ যাচ্ছে এখান থেকেই। এই নিরাপদ আস্তানাটির গৃহকর্ত্রীর ভূমিকায় সাবিত্রীদেবী— বর্ষীয়সী বিধবা মহিলা, মাটির দোতলা গৃহ। দোতলায় থাকেন বিপ্লবীরা একতলায় পুত্র-কন্যা নিয়ে সাবিত্রীদেবী। সন ১৯৩২। তখন প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার বেথুন কলেজ থেকে বি.এ পরীক্ষা দিয়ে কলকাতা ছেড়ে এই আস্তানায় এসে উঠেছেন। তারিখটি ছিল ১৩ জুন, রাত্রি ক্রমে গাঢ় আঁধারে ডুব দিচ্ছে। অপূর্ব সেনের জ্বর, কাজেই প্রীতিলতা অপূর্বের

ধলঘাটের সাবিত্রীদেবী

জন্য বার্লি তৈরি করতে নীচে এসেছেন। এমন সময় তড়িৎবেগে মাস্টারদা নীচে থেকে উপরে উঠে এসে বললেন— পুলিশ। চকিতে নির্মল সেন, অপূর্ব সেন ও মাস্টারদা কর্তব্য স্থির করে। প্রীতিলতা সঙ্গ ছাড়তে নারাজ। কিন্তু মাস্টারদার আদর্শ অলঙ্ঘ্য। পুলিশের কাছে খবর— সূর্যসেন এই আস্তানাতেই আছে। তাই মহাসমারোহে একদল সিপাহির পুরোভাগে ক্যাপ্টেন ক্যামারন এসেছেন ছুটে। মিঃ ক্যামারন গৃহপ্রাঙ্গণে ঢুকেই বীরদর্পে খোলা রিভলবার হাতে মই বেয়ে দোতলায় উঠছিলেন। গর্জে উঠল নির্মল সেনের মারণাস্ত্র। বীরপঙ্গুব ক্যামারন ধুলায় লুটিয়ে পড়লেন। উভয় পক্ষে চলল গুলিবর্ষণ। সহসা নীচ শোনা গেল নির্মল সেনের আর্তনাদ। আহত হয়ে অজ্ঞান অবস্থায় মেঝেতে পড়ে গেলেন মহান বিপ্লবী। মাস্টারদা ও অপূর্ব সেন নীচে নেমে এলেন। প্রীতিলতাকে নিয়ে তাঁরা পেছনের জঙ্গলপথে রওনা হলেন। পথে চলতে শুকনো পাতা তাদের পায়ের চাপে নৈঃশব্দ ভেঙে দিল। এমন সময় সহসা অপূর্ব সেনের বুকে একটি গুলি বিধে গেল— কাজেই সোনার কিশোর ধুলিশয্যায় ঘুমিয়ে পড়লেন চিরদিনের জন্য। মাস্টারদা প্রীতিলতার হাত ধরে কী করে যে শত্রুবেষ্টিত ওই গৃহ ত্যাগ করে ওই দুর্গম পথের অন্ধকারে পালিয়ে যেতে পারলেন— সে এক বিস্ময়!

পরদিন সূর্যোদয়ের সঙ্গে পুলিশবাহিনী এবং নবাগত জেলাকর্তা দেখলেন যে দুটি বিপ্লবী চিরনিদ্রা গ্রহণ করেছেন ও তাঁদের পাশে মৃত্যুনিদ্রালুণ্ঠিত ক্যাপ্টেন ক্যামারন। পুলিশ নির্মল সেনকে শনাক্ত করল। স্বনামধন্য নেতা নির্মল সেনের খোঁজ তারা প্রতিনিয়ত করছে। কিন্তু ধরা পড়লেও তাঁকে ধরে রাখতে পারল না। কিন্তু বিপ্লবের জাদুকর সূর্যসেন হাতের মুঠোয় এলেও বার বার ফসকে যায়! ক্যামারনের মৃত্যু সরকারকে নতুন করে ক্ষিপ্ত করে তুলল। তার জের সামলাতে চট্টগ্রামবাসী হিমসিম খেয়ে গেল। কিন্তু দুরন্ত সন্তানদের চট্টলার বুকে আশ্রয়হারা হতে হয়নি।

ধলঘাটের যুদ্ধের পরদিন সকালে পুলিশ ওই ঘর থেকে কন্যা ও পুত্র-সহ সাবিত্রী দেবীকে গ্রেপ্তার করেই ক্ষান্ত হয়নি, তাঁর মাটির ঘরটি ভেঙে চুরমার করে দিয়ে তারা গায়ের ঝাল মিটিয়েছিল। তারপর সর্বস্বান্ত ওই বিধবা ছেলে-মেয়ের হাত ধরে এসে কাঠগড়ায় দাঁড়ালেন। বিচারে তাঁর দীর্ঘকালীন সশ্রম কারাদণ্ড হলো। তৃতীয় শ্রেণীর কয়েদিরূপে তাঁকে মেদিনীপুর জেলে আনা হলো। একদিন জেলে ছেলে রামকৃষ্ণের কঠিন যক্ষ্মা রোগ ধরা পড়ল। মা তা জানলেন না। মা ও ছেলে থাকেন ভিন্ন ভিন্ন ওয়ার্ডে।

রামকৃষ্ণ চক্রবর্তীর মা সাবিত্রীদেবী নিষ্ঠাবতী বিধবা, কিন্তু মেনে নিয়েছেন তিনি তাঁর অদৃষ্টকে। হায়রে কী ভাগ্য! একদিন জেলওয়ার্ডেন তাঁকে জেলগেটে ডেকে নিয়ে গেল। জেলের মাসিমা, জেলবাসিনীদের পরমাত্মীয়ারা জানতে পারল— বিধবার একমাত্র পুত্র রামকৃষ্ণ যক্ষ্মা রোগে দেহত্যাগ করেছেন। ফলে মাকে শেষ পুত্র-দর্শন করাবার জন্য কর্তাদের তাই এহেন সৌজন্য প্রকাশ!

এভাবে যাঁরা বিপ্লবীদের লালন করেছেন, পলাতক বিপ্লবীর দুর্গম পথচলাকে রমণীয় করে তোলার মন্ত্র তাঁদের জানা ছিল। □

আপাতত সৌরভকে ধরে বাঁচতে চাইছে তৃণমূল

বিমল শঙ্কর নন্দ

২০১৮ সালে সৌরভ গাঙ্গুলি যখন ভারতের সর্বোচ্চ ক্রিকেট নিয়ামক সংস্থা বিসিসিআই (বোর্ড অব কনট্রোল ফর ক্রিকেট ইন ইন্ডিয়া)-এর সভাপতি নির্বাচিত হয়েছিলেন তখন খেলাধুলো বা সমাজের অন্য বিষয়ের খবর রাখেন তেমন মানুষরা খুশি হয়েছিলেন। কারণ ভারতের একটি ক্রীড়াসংস্থায় নিয়ন্ত্রক পদে একজন প্রাক্তন ক্রীড়াবিদ বসবেন এটাই কাম্য। নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বাধীন এনডিএ সরকার এই নীতি মেনে চলার জন্য বিভিন্ন ক্রীড়া সংস্থার কাছে সুপারিশ করেছে। বিভিন্ন সংস্থা এই নীতি গ্রহণ করেছে এবং করছে। জীবনে ব্যাটে বল ছোঁয়াননি এমন ব্যক্তিও বিসিসিআই-এর সভাপতি হয়েছেন। সুখের কথা, ধীরে ধীরে সেই পরিস্থিতির বদল ঘটছে। এখন ভারতের শীর্ষ আদালতও এসব বিষয়ে হস্তক্ষেপ করছেন। আবার ভারতের সবচেয়ে শক্তিশালী (আর্থিকভাবে) এবং প্রভাবশালী ক্রীড়া সংস্থার শীর্ষে একজন বাঙ্গালি অধিষ্ঠিত হয়েছেন এটা বাঙ্গালিদের কাছেও যথেষ্ট শ্লাঘার বিষয় ছিল। কারণ সৌরভ একজন নামি ক্রীড়াবিদ দেশের প্রতিনিধিত্ব করেছেন, দেশকে নেতৃত্ব দিয়েছেন। বাঙ্গালি হিসেবে এতে আনন্দিত হওয়া অপরাধ কিন্তু নয়। কারণ আমরা সব সময় আমাদের পরিচিতি বা আইডেনটিটি বড়ো থেকে ছোটো করতে পছন্দ করি। ভারত বিশ্বকাপ জিতলে আনন্দ পাই, পশ্চিমবঙ্গ জাতীয় প্রতিযোগিতা জিতলে খুশি হই। যে জেলায় বাস করি সেই জেলা যদি কোনও বিষয়ে উল্লেখযোগ্য সাফল্যলাভ করে তাতেও মনে আনন্দ হয়। বৃহৎ থেকে ক্ষুদ্র কিংবা ক্ষুদ্র থেকে বৃহৎ—পরিচিতির এই বদল চলতেই থাকে এবং এটাই স্বাভাবিক।

সৌরভ গাঙ্গুলি তিন বছর বিসিসিআই-এর সভাপতি থাকাকালীন ভারতীয় ক্রিকেটের কতটা অগ্রগতি হয়েছে, কতটা এগিয়েছে বাঙ্গলার ক্রিকেট সে নিয়ে আলোচনা হতেই পারে। সৌরভ বিসিসিআই-এর সভাপতি হিসাবে পুনর্নির্বাচিত না হওয়ায় অনেক বাঙ্গালি দুঃখ পেয়েছেন। সেটাও দোষের নয়। কিন্তু সৌরভ গাঙ্গুলির পুনর্নির্বাচিত না হওয়াকে কেন্দ্র করে বাঙ্গলার সমাজ ও রাজনীতিতে যে পন্থায় বিতর্ক তৈরি করা হলো তার মধ্যে ক্রীড়াপ্রেম কিংবা বাঙালিয়ানা নেই। আছে ,ক'টি নন-ইস্যুকে ইস্যু বানিয়ে রাজনৈতিক ফায়দা লাভের চেষ্টা। দুর্নীতি ও অপশাসনের কারণে তলিয়ে যাওয়া ইমেজকে বাঁচিয়ে তোলার এক মরিয়া চেষ্টা। সৌরভ গাঙ্গুলিকে দ্বিতীয়বারের জন্য বিসিসিআই-এর সভাপতি হিসাবে ভাবা হচ্ছে না এই খবর প্রচারিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গের প্রতি বঞ্চনার সেই পুরানো তরজা শুরু হয়ে গেল। তৃণমূল কংগ্রেসের রাজ্যসভার সাংসদ শান্তনু সেন তাঁর টুইটারে একে স্পষ্টভাবেই 'পলিটিক্যাল ভেনডেটা' বলে উল্লেখ করলেন। তাঁর ভাষায় 'এটা কি তিনি (সৌরভ) মমতার রাজ্য থেকে যাওয়া কার্যকর্তা বলে নাকি তিনি বিজেপিতে যোগ দেননি বলে?" তৃণমূল কংগ্রেসের অন্য নেতারাও এই সুযোগে কেন্দ্রের বিরুদ্ধে একচোট সমালোচনা করে নিলেন। ১৭ অক্টোবর তৃণমূল সুপ্রিমো এবং রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী বলে দিলেন 'সৌরভ গাঙ্গুলিকে বেআইনিভাবে বিসিসিআই থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে। তিনি কেন্দ্রকে অনুরোধ করলেন খেলাধুলোর ক্ষেত্রে কোনও রাজনৈতিক এবং প্রতিহিংসামূলক সিদ্ধান্ত না নিতে এবং প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে অনুরোধ করলেন সৌরভকে ইনটারন্যাশনাল ক্রিকেট কাউন্সিল বা আইসিসি-র সভাপতি পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতার সুযোগ করে দিতে। একটি বাংলা সংবাদ চ্যানেলে এক ক্রীড়া সাংবাদিক তো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের এই বক্তব্যকে ক্রিকেটীয় পরিভাষায় 'গুগলি' কিংবা 'দুসরা' বলের সঙ্গে তুলনা করলেন। কারণ এরপর বিসিসিআই যদি সৌরভকে আইসিসি-র প্রেসিডেন্ট পদে লড়ার জন্য মনোনীত করে তবে সমস্ত কৃতিত্বই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নিয়ে নেবেন। আর মনোনীত না করলে তৃণমূল কংগ্রেস এটাকে বাংলার বঞ্চনা হিসেবে তুলে ধরতে পারবে এবং এর সমস্ত রাজনৈতিক সুবিধা তৃণমূলই পাবে। বিসিসিআই সৌরভ গাঙ্গুলিকে আইসিসি-র প্রেসিডেন্ট পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার জন্য মনোনীত করেনি। তার জন্য বাঙ্গলার সমাজ এবং রাজনীতিতে ভূমিকম্প ঘটে গেছে এমন প্রমাণ এখনো পাওয়া যায়নি। পশ্চিমবঙ্গের শাসক দলের একটি প্রভাবশালী অংশ সৌরভকে বাঙ্গলার ক্রিকেট নিয়ামক সংস্থা ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশান অব বেঙ্গল বা সিএবি-এর সভাপতি করার উদ্যোগ নিলেও

কোনও কারণে সৌরভ সেই পদ গ্রহণ করেননি। তিনি মোহনবাগান ক্লাবের অন্যতম ডিরেক্টর হিসেবে মনোনীত হয়েছেন।

পশ্চিমবঙ্গের বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতি এবং বেশ কিছু অস্বস্তিকর বিতর্কে শাসক তৃণমূল কংগ্রেসের জড়িয়ে যাওয়ার প্রেক্ষাপটে সৌরভের বিসিসিআই এপিসোডটিকে বিশ্লেষণ করা যেতে পারে। ২০২১ সালে তৃতীয়বারের জন্য পশ্চিমবঙ্গের ক্ষমতা দখল করার পর থেকেই একের পর এক বিতর্ক তাড়িয়ে বেড়াচ্ছে শাসক তৃণমূল কংগ্রেসকে। বহু বিতর্কের মধ্যে সবচেয়ে বড়ো হলো ঘুসের বিনিময়ে স্কুলে শিক্ষক নিয়োগ। ঘুস নেওয়ার অভিযোগে বর্তমান রাজ্য সরকারের মন্ত্রী পার্থ চ্যাটার্জি, এম.এল.এ এবং প্রাথমিক শিক্ষা সংসদের চেয়ারম্যান মানিক ভট্টাচার্য, বীরভূমের দোর্দণ্ডপ্রতাপ তৃণমূল নেতা অনুব্রত মণ্ডল-সহ বহু গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি জেলে। যতদিন যাচ্ছে দুর্নীতির নতুন নতুন অভিযোগ উঠে আসছে। যোগ্য চাকরিপ্রার্থীরা ন্যায় বিচারের দাবিতে প্রায় ৬০০ দিনের কাছাকাছি অবস্থান ও আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছেন। জনমানসে শাসকদলের শাসন করার যোগ্যতা ও বৈধতা নিয়ে গুরুতর প্রশ্ন উঠে গেছে। এই পরিস্থিতি থেকে বেরিয়ে আসার প্রাণপণ প্রচেষ্টা চালাচ্ছে শাসক তৃণমূল কংগ্রেস। সেই লক্ষ্যেই সৌরভ গাঙ্গুলির ইস্যুটিকে তুলে ধরার চেষ্টা এবং খণ্ড জাতীয়তাবাদী ভাবনাকে উসকানি দেওয়ার এই চেষ্টা। সাধারণভাবে বাঙালিয়ানাকে গুরুত্ব দিলে বা বাঙ্গলার স্বার্থকে তুলে ধরার মধ্যে দোষের কিছু নেই। কিন্তু কোনও ঘটনাকে ভুলভাবে ব্যাখ্যা করে খণ্ড জাতীয়তাবাদকে উসকানি দেওয়া অন্যায়। বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকার খেলাধুলোর জগতে রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ বন্ধ করার চেষ্টা করছে। ভারতের সর্বোচ্চ আদালতও এ বিষয়ের প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রেখেছেন। ক্রীড়া সংস্থাগুলির সর্বোচ্চ পদে যাতে প্রাক্তন ক্রীড়াবিদরা অধিষ্ঠিত হন সে বিষয়টি নিশ্চিত করার চেষ্টা চলছে। ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী তাঁর ১৫ আগস্টের স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষ্যে লালকেল্লা থেকে প্রদত্ত ভাষণে কেবল রাজনীতির ক্ষেত্র থেকেই নয়, সমস্ত ক্ষেত্র থেকেই পরিবারবাদ এবং ক্ষমতা আঁকড়ে থাকার মনোবৃত্তির অবসানের ওপর জোর দিয়েছেন। বিসিসিআই-এর সভাপতি পদে সৌরভের পর যিনি মনোনীত হয়েছেন তিনিও একজন প্রাক্তন ক্রীড়াবিদ। ১৯৮৩ এর বিশ্বকাপ জয়ী ক্রিকেট দলের অন্যতম সদস্য রজার বিনি। কেন্দ্রের শাসক দলের কোনও নেতা বা মন্ত্রী সেই পদে বসেননি।

বি সি সি আই-এর সভাপতি পদে সৌরভের দ্বিতীয়বার নির্বাচিত হতে না পারার সঙ্গে বাঙ্গলার বঞ্চনাকে জুড়ে দিয়ে একটি মিথ্যে ন্যারেটিভ তৈরির চেষ্টাকে সবার সামনে উন্মুক্ত করে দিয়েছেন বিধনাসভার বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। তাঁর বক্তব্য হলো শাসক তৃণমূল কংগ্রেস যদি বাঙ্গলার স্বার্থ, বাঙ্গালিয়ানা নিয়ে এতোটা চিন্তিত তবে বাঙ্গলার ব্র্যান্ড অ্যামবাসাডার হিসেবে শাহরুখ খানকে মনোনীত করা হয়েছে কেন? সেই পদে বাঙ্গলার অন্যতম সফল ক্রীড়াবিদ সৌরভ গাঙ্গুলিকে নিযুক্ত করা যেতে পারতো। কারণ শাহরুখ নন, সৌরভই বাঙ্গলার ভূমিপুত্র। বাঙ্গলার ব্র্যান্ড অ্যামবাসাডার হওয়ার যোগ্য ব্যক্তি সৌরভই।

নিঃসন্দেহে সৌরভ গাঙ্গুলি বাঙ্গলার অন্যতম জনপ্রিয় ক্রীড়াবিদ। টেলিভিশন জগতেও তিনি একজন জনপ্রিয় বিনোদনকারী বা এনটারটেইনার। ডুবন্ত মানুষের খড় আঁকড়ে ধরার মতো পশ্চিমবঙ্গের শাসকদলও সেই জনপ্রিয়তাকে আঁকড়ে ধরে তাকে কাজে লাগিয়ে মানুষের দৃষ্টি ঘোরানোর প্রাণপণ চেষ্টা চালিয়েছে। কিন্তু এই চেষ্টা সফল হওয়া অসম্ভব। কারণ তথ্যের মুক্ত চলাচলের এই যুগে মানুষ সব খবরই রাখে। বিসিসিআই-তে কেউ দ্বিতীয়বারের জন্য সভাপতি নির্বাচিত হননি। এমনকী দোর্দাণ্ডপ্রতাপ শারদ পাওয়ার কিংবা জগমোহন ডালমিয়াও নন। বিজেপিতে যোগ না দেওয়ার জন্য সৌরভকে বিসিসিআই থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে এমন হাস্যকর অভিযোগ সৌরভ গাঙ্গুলি নিজেও করেননি। পশ্চিমবঙ্গের সমাজ এখন দুর্নীতি, অপশাসন, অনুন্নয়ন, কর্মহীনতা প্রভৃতি বিবিধ সমস্যায় জর্জরিত। সৌরভ গাঙ্গুলি বিসিসিআই কিংবা আইসিসি যেখানকারই প্রেসিডেন্ট হন বাঙ্গলার মানুষ এই সব ভয়ংকর সমস্যা থেকে মুক্তি পাবে না। তাই জনমানস থেকে ইতিমধ্যেই সৌরভের বিসিসিআই ইস্যু দূরে সরে গেছে। এটাই হওয়ার ছিল। মানুষের জীবন ও জীবনধারার সঙ্গে গভীরভাবে যুক্ত না থাকলে কোনো বিষয়ই বেশিদিন জনমানসে টিকে থাকে না, থাকতে পারে না। □

শাসক দলের কফিনে শেষ পেরেক
চাকরি প্রার্থীদের ওপর পুলিশের বর্বরোচিত আক্রমণ

জাহ্নবী রায়

রাত তখন অনেকটাই গভীর। ৮৪ ঘণ্টার অনশনে ক্লান্ত ও শ্রান্ত অনেকগুলি মুখ। শরীরে আর জোর নেই নিজেকে টেনে তোলার। রাত ১২.১০ মিনিট। রাজ্যের শাসক দলের বর্তমানে দাস হয়ে যাওয়া পুলিশ সময় নিল মাত্র ১৫ মিনিট। আর এক বাস্তব স্বপ্নকে হত্যা করে তুলে দেওয়া হলো বর্বরোচিত আক্রমণে টেট পাশ করা চাকরি প্রার্থীদের। এর আগে রাস্তায় কেটেছে প্রায় ৬০০ দিন। এখানে মানুষ আইনের প্রশ্ন তুলেছেন। রাত্রে এভাবে কি আক্রমণ বা অপারেশন চালানো যায়? আটক করা যায় মহিলাদের? যেভাবে যে ভাষায় তাদের গালিগালাজ, সেটা কি বলা যায়? বুট আর হেলমেটের আঘাত যেভাবে নেমে এসেছে ভবিষ্যতের নাগরিক তৈরির কারিগরদের ওপর সেটা কি করা যায়? রাস্তার কুকুরের মতো করে আটক করা মহিলাদের ছেড়ে দেওয়া হয়েছে যেখানে সেখানে। এটা কি ঠিক? আটক করা মহিলারা মিডিয়ার সামনে বলেছেন, তাঁরা নিরাপত্তা চাইলে পুলিশের তরফ থেকে আসে গঞ্জনা, কটূক্তি। রাত তিনটের কিছু পরে মহিলাদের ছেড়ে দেওয়া হয় শিয়ালদহ স্টেশনে। কেন এমনটা হলো?

২০১৪ সালে পাশ করা টেট পরীক্ষার্থীদের সঙ্গে এবার শুরু হয়েছে ২০১৭ সালের পাশ করাদের বিভাজন প্রক্রিয়া। যেমনটি হয়েছিল কংগ্রেস আমলে। সেই সময়কার কথা অনেকেরই মনে আছে যে নকশাল আন্দোলন তখন পশ্চিমবঙ্গের শাসন ব্যবস্থাকে ধাক্কা দিচ্ছিল। সেই সময়ে দুটি বিভাজন তৈরি করে দেওয়া হয়েছিল। বামেদের কৌশলে সেই সময়ে তথাকথিত কং-শাল নামের একটি গোষ্ঠী তৈরি করে স্লো পয়জনিং করা হয়েছিল। আর নকশাল আন্দোলনকে পথভ্রষ্ট করেছিল সেই গোষ্ঠী। সফলতা পেয়েছিল বামেদের উদ্দেশ্য।

এবার প্রসঙ্গত আসা যাক এই আন্দোলনে আর সঙ্গে অনশন আন্দোলনের কথায়। রাজ্যের তৃণমূল সুপ্রিমোই তো এই আন্দোলনের পথ প্রদর্শক। সিঙ্গুর নিয়ে তিনি টানা ২৬ দিন ধর্মতলায় ব্যস্ততম রাস্তায় বসে ছিলেন। রাজীব কুমারের বাড়িতে সিবিআইয়ের হানার ঘটনা ঘটল, তিনি রাস্তায় বসে পড়লেন, অবরোধ হলো। সিঙ্গুরের রাস্তায় বসে থাকা, নন্দীগ্রামের জন্য আন্দোলনের কথা কি মাননীয়া ভুলে গেছেন?

আজ রাস্তায় বসে থাকা চাকরিপ্রার্থীরা যে তাঁদের দাবিতে ঠিক, সেটা তো ইতিমধ্যেই প্রমাণিত সত্য। তাদের হকের চাকরি পয়সার বিনিময়ে হাত বদল হয়ে গেছে। বাস্তব চিত্রটা এই যে, সেই সময়ের শিক্ষা দপ্তরের প্রায় সবাই হাজতের ভিতরে।

প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদের বর্তমান দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি সাংবাদিকদের ডেকে নানা রাজনৈতিক হুংকার দিচ্ছেন। তার কি ওই পদে বসে এই হুংকার দেওয়া সাজে? তিনি এই উত্তর কি দিতে পারেন, তাঁর পূর্বতনরা কী কারণে হাজতবাস করছেন? তিনি কি সাধু হতে পারেন, পরবর্তী সময়ে দায়িত্ব নিয়ে পূর্বের দায় কি এড়াতে পারেন? এই প্রশ্নও ঘুরে বেড়াচ্ছে আনাচে-কানাচে। তিনি শাসক দলের তাঁবেদারি করুন, কিন্তু সফল চাকরিপ্রার্থীদের আঘাত করার বা শিক্ষা দপ্তরের ঘাড় থেকে দায় ঝেড়ে ফেলার ক্ষমতা কে তাকে দিল? এই প্রশ্ন তুলেছেন রাজনৈতিক মহলের একাংশ।

অনশন করতে থাকা চাকরিপ্রার্থীদের নিয়ে রাজনৈতিক ফয়দা তোলার আসরে বামেরা কোমর বেঁধে নেমেছেন। তাঁরাও যে ধোয়া তুলসীপাতা নন, সেটা গত ৩৪ বছরের বাম জমানার মধ্যগগন থেকে শেষ লগ্ন পর্যন্ত স্বজনপোষণ বা চিরকুটে চাকরির তত্ত্বে প্রমাণিত। বিশেষ করে প্রাথমিকে শিক্ষকতার চাকরি পাবার ক্ষেত্রে। সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে কোন মুখে নিজেরা সততার মুখোশ পরে রাজনৈতিক ফয়দা তোলার চেষ্টা বামপন্থীরা করে চলেছেন সেটা নিয়ে প্রশ্ন তোলা যেতেই পারে। সেই সময়ে মনে হয় এইভাবে রাস্তায় বসে চাকরিপ্রার্থীদের চাকরি চাইবার অধিকার ছিল না। সেই সময়েও বঞ্চিত হয়েছেন চাকরিপ্রার্থীরা। একথা বা অভিযোগ আজও ঘুরেফিরে বেড়াচ্ছে রাজ্যের কোণায় কোণায়।

এই ডামাডোলে ৬০০ দিনের বেশি রাস্তায় বসে থাকা সফল চাকরি প্রার্থীরা এখন দ্বিধাগ্রস্ত। ভবিষ্যৎ জীবন নিয়ে অন্ধকারের অতলে তলিয়ে যাবার পথের সামনে এসে দাঁড়িয়েছেন তাঁরা। □

মৃত্যুর প্রেক্ষাপটে জীবনের নকশি কাঁথা

সন্দীপ চক্রবর্তী

অলোক সরকার যুবাপুরুষ। যে বয়েসে তাঁর জীবনকে আতশ কাচের নীচে রেখে নিরীক্ষণ করার কথা সেই বয়েসে তিনি মৃত্যুর অলিগলিতে ঘুরে বেড়ানো মনস্থ করেছেন। বলাবাহুল্য, এই পর্যটন ঠিক অবকাশযাপনের উদ্দেশ্যে নয়। মৃত্যুর স্বরূপ বুঝতে তিনি অবলীলায় পৌঁছে গেছেন শ্মশানে। শ্মশান তাকে নিরাশ করেনি। অকপট সরলতায় শুনিয়েছে তার নিজের গল্প। তার মিথ, পুরাণ, ইতিহাস। তার হাসিকান্না ও আনন্দ-যন্ত্রণার কথা। সেই কথা দিয়ে অনুপম ছবি এঁকেছেন অলোক সরকার তাঁর **শ্মশান : মিথ পুরাণ ইতিহাস** গ্রন্থে।

হিন্দু শাস্ত্রে আত্মা অবিনশ্বর। গীতায় শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন, শরীর যখন জীর্ণ হয়ে পড়ে তখন আত্মা পুরনো শরীর ত্যাগ করে নতুন শরীর ধারণ করে। আত্মার শরীর ত্যাগ করাকে বলে মৃত্যু। গীতায় শ্রীকৃষ্ণ যে ব্যাখ্যা দিয়েছেন তাতে মৃত্যু জীবনেরই এক অঙ্গ। এক অনিবার্য সত্য। কিন্তু তা সত্ত্বেও মৃত্যু মানুষকে মুহূর্তের জন্যেও স্বস্তি দেয় না। বিশেষ করে জীবনের শেষবেলায়, যখন পড়ন্ত আলোয় দিনগুলো ধূসর হয়ে আসে তখন এক অজানা আশঙ্কায় মানুষের বুক কেঁপে ওঠে। পাথরের মতো ভারী এক জিজ্ঞাসায় উচাটন হয় মন, সময় কি হয়ে গেল? ক'জনই-বা পারেন মৃত্যুকে সত্য মেনে তাকে আপন করে নিতে? মৃত্যুর ভাবনায় ভয় আর মন খারাপই শুধু জয়ী হয়। মৃত্যু নিয়ে মানুষের এই ভয়কে লেখক চমৎকার ভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন। তবে আশার কথা তিনি শুধু ভয়েই আটকে থাকেননি। শ্মশানেরও যে ইতিহাস আছে, তাকে নিয়ে মিথ্যে ভয় জাগানো অনেক মিথ আছে, পুরাণে

কোথায় কতবার উল্লেখ রয়েছে শ্মশানের— সবই জানা যাবে এই গ্রন্থ থেকে।

কিন্তু এতো গেল শ্মশানের বহিরঙ্গ। মন কই শ্মশানের? না, সেখানেও নিরাশ করেননি লেখক। ইসলামিক আমল থেকে ব্রিটিশ আমল— সেখান থেকে আধুনিককাল অবধি এক বিশাল কালপর্ব জুড়ে বাঙ্গলার বিভিন্ন শ্মশানের মনের কথা তিনি শুনিয়েছেন। বেদ-পুরাণ থেকে শুরু করে মঙ্গলকাব্য, রেনেসাঁ পর্বে বাংলা কবিতা— সেখান থেকে গ্রামবাঙ্গলার নানা প্রবাদ-প্রবচন, ছড়া, পাঁচালি, লৌকিক কবিতার পঙ্‌ক্তি উদ্ধার করে দেখিয়েছেন বাঙ্গালি কবিমানসে কতটা পরিব্যাপ্ত ছিল শ্মশানের অবস্থান। বাংলা সাহিত্যে শ্মশানকে জীবনের চালচিত্র করে গল্প-উপন্যাস রচনার ঐতিহ্য বড়ো কম দিনের নয়। অবধূতের কালজয়ী উপন্যাস উদ্ধারণপুরের ঘাট, কমলকুমার মজুমদারের অন্তর্জলি যাত্রা এবং সমরেশ বসুর ছোটোগল্প শ্মশানচাঁপা এ প্রসঙ্গে সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। সতীদাহ নিয়ে লেখা সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের একটি কবিতার কথাও এখানে উল্লেখ করতে হয়। প্রসঙ্গত বর্তমান গ্রন্থের লেখকও সতীদাহের কথা বলেছেন। বর্ণনা করেছেন এই নিষ্ঠুর প্রথার ইতিহাস। গ্রন্থ রচনার উদ্দেশ্যকে তা যে আরও পরিপুষ্ট করেছে তাতে কোনও সন্দেহ নেই। শ্মশান বলতে আমরা মৃত্যু বুঝি, চিতার আগুন বুঝি, প্রিয়জনের ব্যথা বুঝি, কিন্তু যাদের বাদ দিয়ে দাহকাজ সম্ভব নয় সেই ডোমেদের পাশ কাটিয়ে যাই। লেখককে ধন্যবাদ, তিনি পাশ কাটিয়ে যাননি। মরমি ভাষায় লিখেছেন তাঁদের স্ত্রী-পুত্র-পরিবারের কথা। চিতার অর্ধদগ্ধ কাঠে রান্না করেন যে ডোম রমণী— কেমন লাগে তার এই মৃত্যুর ধূসর উপত্যকায় ঘরকন্না করতে? লেখক কয়েকজন বিশিষ্ট বাঙ্গালির অন্তিম যাত্রার ইতিহাস বর্ণনা করেছেন।

লেখকের ভাষা চমৎকার। অন্তত এই গ্রন্থের জন্য যে অন্তঃসলিলা বিষাদের সুরটি দরকার ছিল তা তাঁর ভাষায় অকৃত্রিম ভাবে ফুটে উঠেছে। লেখকের পরিমিতিবোধের প্রশংসা করতে হয়, কারণ বিষাদের ভারে ভারাক্রান্ত হবার সম্ভাবনাটিকে তিনি অঙ্কুরেই বিনষ্ট করতে পেরেছেন। নবীন বয়সে এমন একটি 'বাহাত্তুরে' বিষয়ে গ্রন্থ রচনার সিদ্ধান্ত নেবার জন্যেও লেখককে ধন্যবাদ দিতে হয়। প্রকাশকের কাজও আশাব্যঞ্জক। মুদ্রণ প্রমাদ বিশেষ চোখে পড়ে না। প্রচ্ছদও চমৎকার। সব মিলিয়ে বইটির সর্বাঙ্গীণ সাফল্য কামনা করি।

পুস্তকের নাম : শ্মশান : মিথ পুরাণ ইতিহাস। লেখক : অলোক সরকার। পরিবেশক : কলেজস্ট্রিটে সুপ্রীম বুক ডিসট্রিবিউটার্স। মূল্য : ৪৯৯ টাকা।

ঋতুচক্র নিয়ে সচেতনতা প্রচার করছেন হুগলীর প্যাডম্যান

বিশেষ প্রতিনিধি ।। প্রযুক্তির শিখর ছুঁয়েছে মানুষ। প্রতিদিন উন্নত হচ্ছে বিজ্ঞান। গ্রামের বাড়িতে বাড়িতে এখন ফোর্থ জেনারেশন নেটওয়ার্কের ঢল। তবু আমাদের সমাজে মহিলাদের নিয়ে ছুঁতমার্গ এখনও অব্যাহত। এখনও তাদের সাধারণ মাতৃত্বের লক্ষ্মণগুলি নিয়ে ছুঁতমার্গের বাড়াবাড়ি। পরিবারের কেউ ঋতুমতী হলে কয়েকটাদিন তার ব্রাত্য থাকাটাই রেওয়াজ। অবশ্য বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই বাড়ির বয়স্ক মাতৃস্থানীয়ারাই নানারকম অন্ধবিশ্বাস আর কুপ্রথার দোহাই দিয়ে পরবর্তী প্রজন্মকে ভুল বোঝান। ফলে সামান্য শারীরিক জৈবিক প্রক্রিয়া নিয়ে একরাশ লজ্জা ও ভয় প্রজন্মের পর প্রজন্মকে হয়রান করে চলেছে।

পিরিয়ড বা ঋতুচক্র চলাকালীন শুধুমাত্র সচেতনতার অভাবে কত মা-বোন ক্যানসারের মতো রোগের শিকার হচ্ছেন তার ইয়ত্তা নেই। এরকম এক পরিস্থিতিতে মা-বোনেদের সুরক্ষার কথা ভেবে এগিয়ে এসেছেন হুগলীর সুমন্ত বিশ্বাস। আমরা 'প্যাডম্যান' সিনেমায় দেখেছি অক্ষয় কুমার পিরিয়ড নিয়ে সচেতনতা প্রচার করতে স্বল্প মূল্যের স্যানিটারি ন্যাপকিন তৈরি করে বিপ্লব ঘটিয়েছিলেন। সুমন্ত হলেন বাস্তবের 'প্যাডম্যান'। পেশায় তিনি ভূগোলের গৃহশিক্ষক। ১০ বছর ধরে তিনি সমাজ সচেতনতা প্রচারে যুক্ত রয়েছেন। প্রত্যন্ত গ্রামেগঞ্জে গিয়ে তিনি মা-বোনেদের স্যানিটারি ন্যাপকিন ব্যবহার করার পরামর্শ দেন। এবং স্বাস্থ্য সচেতনতা শিবিরের আয়োজন করেন। এই কাজে যোগ্য সঙ্গত দেয় সুমন্তর ছাত্র-ছাত্রীরা।

৩৫ বছরের সুমন্ত চন্দননগরের বাসিন্দা। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর তাঁর জীবনের অনুপ্রেরণা। বিদ্যাসাগর যেভাবে অজস্র বাধা অতিক্রম করে লড়াই করেছেন মেয়েদের অধিকারের জন্য, ঠিক তেমনি আজকের দিনে সমাজের পিছিয়ে পড়া মহিলাদের সচেতন করার জন্য এগিয়ে এসেছেন তিনি। পশ্চিমবঙ্গের বহু প্রান্তিক গ্রামে জনজাতি পল্লীগুলিতে আজও ঋতুচক্র নিয়ে মেয়েদের মধ্যে সচেতনতার অভাব রয়েছে। আজও সেখানে মেয়েরা পিরিয়ডের সময় মলিন কাপড় ব্যবহার করেন। সুমন্ত ও তার সহযোগীরা সেখানে গিয়ে পরিবারের মেয়েদের ন্যাপকিন ব্যবহার করার উপযোগিতা সম্পর্কে সচেতন করেন। ঋতুচক্র যে খারাপ কিছু নয়, মহিলাদের স্বাভাবিক শারীরিক প্রক্রিয়া মাত্র সে সম্পর্কে বোঝান। তার জন্য নানারকম প্ল্যাকার্ড, ব্যানার, প্রেজেন্টেশন, কেসস্টাডি তৈরি করেছেন বাস্তবের এই প্যাডম্যান।

সুমন্ত জানান, ''আজকাল অনেকেই তো স্যানিটারি ন্যাপকিন বিতরণ করেন। কিন্তু পিরিয়ড সম্পর্কে অপধারণা দূর করাটাও জরুরী। গ্রামগঞ্জের দিকে বিশেষ করে জনজাতি এলাকায় ঋতুচক্র নিয়ে মহিলাদের মধ্যে বেশ কিছু অন্ধবিশ্বাস রয়েছে। সেগুলোকে দূর করা আমাদের কর্তব্য।'' চন্দননগরের সুভাষপল্লীর বাসিন্দা সুমন্ত বিশ্বাস এলাকায় ভূগোল স্যার হিসেবে জনপ্রিয়। ইদানীং প্যাডম্যান বললে সবাই এক ডাকে তাকে চিনে নেয়। পড়ানোর পাশাপাশি বরাবরই মহিলাদের জন্য কিছু করার ইচ্ছা ছিল তাঁর। সুমন্ত বলেন, অর্থ ও শিক্ষার অভাবে অনেকেই নোংরা, স্যাঁতসেঁতে কাপড় ব্যবহার করেন। যার ফল জরায়ুর ক্যানসার। তাই এই সম্পর্কে জনসচেনতা গড়ে তোলার সঙ্কল্প নিয়েছি।

দূরবর্তী গ্রামের প্রান্তিক এলাকায় এখনও এরকম অনেক পরিবার আছে যাদের পক্ষে সম্ভব হয় না স্যানিটারি প্যাড কিনে ব্যবহার করার। সেক্ষেত্রে যদি রেশন থেকে স্যানিটারি ন্যাপকিন দেওয়া হয় তাহলে একাধারে যেমন তা দুঃস্থ মানুষের কাছে সহজলভ্য হবে, ঠিক তেমনই সরকারি উদ্যোগে রেশনে এই ন্যাপকিন দেওয়া হলে মানুষের মধ্যে পিরিয়ড নিয়ে ভুল ধারণা দূর হবে। তাই সরকারি উদ্যোগে রেশনে স্যানিটারি ন্যাপকিন দেওয়ার দাবি জানাচ্ছেন প্যাডম্যান সুমন্ত।

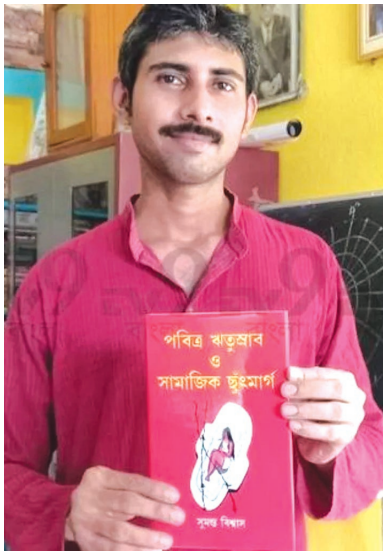

প্যাডম্যান হিসেবে সুমন্তবাবুর পথচলা শুরু ২০১৮-র গোড়ার দিকে। নিজের ছাত্র-ছাত্রীদের নিয়ে তিনি 'ভূসংকল্প' নামে একটি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা তৈরি করেছেন। নিজের বেতনের টাকা এবং ছাত্র-ছাত্রীদের অনুদানের অর্থে স্যানিটারি ন্যাপকিন কেনেন সুমন্ত। এরপর বিভিন্ন জায়গায় গিয়ে বিশেষ করে জনজাতি মা-বোনেদের তা বিতরণ করেন।

প্রথমে বোলপুরের এক জনজাতি গ্রাম থেকেই সাফল্যের সঙ্গে এই কাজ শুরু। তারপর পাণ্ডুয়া, হরিপাল, সিঙ্গুর থেকে শুরু করে পুরুলিয়া এমনকী সুন্দরবনে গিয়েও ন্যাপকিন বিলি করেছেন। সিঙ্গুর হাই মাদ্রাসা ও স্টেশন সংলগ্ন বস্তি এলাকার মহিলাদের প্রতি মাসে স্যানিটারি ন্যাপকিন দেওয়ার দায়িত্ব নিয়েছে তার সংস্থা 'ভূসংকল্প'। সেখানকার মহিলারা এখন অনেকটাই সচেতন হয়েছেন এবং তাঁর পাঠানো ন্যাপকিনের জন্য অপেক্ষা করে থাকেন, জানান সুমন্ত।

এর পাশাপাশি ঋতুচক্র সম্পর্কে ভুল ধারণা দূর করতে ভ্রাম্যমান মেন্সট্রুয়াল স্কুলও করেছেন ভূগোল শিক্ষক সুমন্ত। যদিও এই সব কাজের জন্য তিনি কোথাও কোথাও প্রাণনাশের হুমকিও পেয়েছেন। তবে ভালো কাজ করতে গেলে প্রতিবন্ধকতা আসবেই। সেসব পেরিয়ে মানুষের জন্য কাজ করতে হবে বলে মনে করেন হুগলীর প্যাডম্যান। 'পবিত্র ঋতুস্রাব ও সামাজিক ছুৎমার্গ' নামে একটি বইও লিখেছেন তিনি। বই বিক্রির সব টাকা ভূসংকল্পের কাজেই ব্যয় হয়। □

সেরিবা ও সেরিবান

বহুদিন আগে এক রাজ্যে বাস করত সেরিবা ও সেরিবান নামে দুই ফেরিওয়ালা। সেরিবান অত্যন্ত সৎ ও নির্লোভ ছিল। সবাইকে সে সাহায্য করত বলে সবাই তাকে ভালোবসত। আর সেরিবা ছিল অত্যন্ত লোভী। টাকাপয়সার জন্য মানুষকে ঠকাতে তার জুড়ি ছিল না। দুজনের পেশা এক হওয়াতে তারা ঠিক করে নিত যে কে কোন রাস্তায় যাবে। সেরিবা যে রাস্তায় যেত সেরিবান সে রাস্তায় ফেরি করত না।

অন্ধপুরন নামে এক নগরে একদিন তারা গেল ফেরি করতে। এই নগরে এক সময় বাস করত এক ধনী বণিক। প্রচুর ধনসম্পত্তি ছিল তার। ভাগ্যের পরিহাসে একদিন তারা সর্বস্বান্ত হয়ে গেল। একে একে তার পরিবারে সব পুরুষের মৃত্যু হলো। সংসারে রইল শুধু এক বুড়ি ঠাকুমা ও তার এক ছোট্ট নাতনি।

লোকের বাড়িতে বাড়িতে কাজ করে ঠাকুমা ও নাতনির সংসার চলত। সম্বল বলতে ছিল শুধু বাড়িটা। আর ছিল একটা পুরানো থালা। বহু দিন ব্যবহার না হওয়ায় থালাটি নোংরা হয়ে পড়েছিল ঘরের এক কোণে। একদিন লোভী সেরিবা সেই বণিকের বাড়ির সামনে দিয়ে যাচ্ছিল জিনিস ফেরি করতে করতে। সেরিবা হাঁক দিচ্ছিল— কলসী নেবে, খেলার পুতুল, গয়না নেবে গো সস্তা দামে।' ফেরিওয়ালার ডাক শুনে বুড়ির নাতনি এক ছুটে হাজির হলো ঠাকুমার কাছে। ঠাকুমার কাছে সে বায়না ধরল একটা গয়না কিনে দেবার। ঠাকুমা বলে উঠল আমার তো গয়না কিনে দেবার সাধ্যি নেই দিদি। নাতনি বলে উঠল, ওই যে আমাদের পুরনো থালাটা আছে, ওটা কোনো কাজে লাগে না। ঠাকুমা মনে মনে ভাবল তাইতো!

ফেরিওয়ালা সেরিবাকে ডেকে ঠাকুমা বলল, এই থালাটির বদলে আমার নাতনিকে একটা গয়না দাও তো। থালাটি কয়েক বার ঘুরিয়ে ফিরিয়ে সেরিবা বুঝতে পারল থালাটি সোনার। থালাটি যে সোনার বুড়ি তা জানে না। তাই এক পয়সার গয়নার জন্য থালাটি দিতে চাইছে। এদিকে লোভে সেরিবার চোখ চকচক করে উঠল। সে মনে মনে ভাবল আজ তার ভাগ্য খুবই ভালো। সে ঠাকুমা আর তার নাতনিকে ঠাকাবার জন্য বলল, এই থালাটির কিছু দাম নেই, এর বিনিময়ে আমি তোমাদের কিছুই দিতে পারব না। বলে সেরিবা চলে গেল।

কিছুক্ষণ পরেই সেই রাস্তায় ফেরি করতে করতে সেরিবান চলে এল। নাতনি আবার বায়না ধরল। সেরিবানকে থালাটি দেখিয়ে ঠাকুমা বলল, এটার বদলে একটা গয়না দেবে? থালাটি কয়েকবার ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখে সেরিবান বলল, ঠাকুমা এটা তো সোনার থালা। এ থালা আমি নিতে পারব না। অত টাকা আমার কাছে নেই। বুড়ি বলল কী বলছ তুমি, একটু আগেই এক ফেরিওয়ালা বলল এটার কোনো দাম নেই। তা তুমি এটার বদলে আমার নাতনিকে একটা গয়না দাও। সেরিবান নাতনিকে অনেকগুলো গয়না এবং তার কাছে থাকা নগদ হাজার কাহন দিয়ে থালাটি নিয়ে চলে গেল।

এর কিছুক্ষণ পরেই সেরিবা আবার এসে হাজির হলো। সে যখন শুনলো যে সেরিবান হাজার কাহন দিয়ে থালাটি নিয়ে গেছে, তখন হায় হায় করে নিজের জিনিসপত্র ফেলে দিয়ে পাগলের মতো নদীর দিকে ছুটতে লাগল। নদীর ঘাটে এসে চিৎকার করে সেরিবানকে ডাকতে লাগল। কিন্তু নৌকা এগিয়েই যেতে লাগল। সেরিবা এই চরম ক্ষতির শোক সামলাতে না পেরে নদীর ঘাটে পড়েই মারা গেল। এই সেরিবানই হলো বোধিসত্ত্বের জন্মান্তরের নাম।

(সংগৃহীত)

ভারতের বিপ্লবী

সূর্য সেন

বিপ্লবী সূর্য সেন ১৮৯৩ সালের ১৮ অক্টোবর চট্টগ্রামের নোয়াপাড়ায় জন্মগ্রহণ করেন। মাস্টারদা নামেই তিনি পরিচিত। কলেজে পড়ার সময় বিপ্লবীদলের সদস্য হন। শিক্ষকতা গ্রহণ করেও বিপ্লবী কাজকর্মে নেতৃত্ব দিতে থাকেন। চট্টগ্রাম শহরের দুটি অস্ত্রাগার আক্রমণ ও দখল করে এলাকা থেকে ব্রিটিশ শাসন মুছে দেবার পরিকল্পনা করেন। সর্বাধিনায়ক মাস্টারদার নতৃত্বে ৬৫ জন অকুতোভয় যুবক দুটি অস্ত্রাগার ও পুলিশ লাইন এবং ডাক ও তার অফিস একযোগে আক্রমণ করে দখল করেন। বিপ্লবীরা জালালাবাদ পাহাড়ে আশ্রয় নিলে ব্রিটিশ পুলিশ খবর পেয়ে তাদের ঘিরে ফেলে। বীরের মতো যুদ্ধে বহু বিপ্লবী প্রাণ হারান। ইংরেজ সরকার মাস্টারদাকে গ্রেপ্তারের জন্য বহু টাকা পুরস্কার ঘোষণা করে। অবশেষে এক জ্ঞাতি ভাইয়ের বিশ্বাসঘাতকতায় তিনি ধরা পড়েন। বিচারে তিনি প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হন।

জানো কি?

- গীতা মহাভারতের অংশ।
- মহাভারত ১৮টি অধ্যায়ে বিভক্ত।
- শ্রীকৃষ্ণ গীতার জ্ঞান প্রথম দিয়েছিলেন সূর্যদেব বিবস্বানকে।
- গীতায় ৭০০টি শ্লোক আছে। তাই সপ্তশতী বলা হয়।
- ধৃতরাষ্ট্র ১টি, অর্জুন ৮৫ টি এবং শ্রীকৃষ্ণ ৫৭৪ টি শ্লোক বলেছেন।
- গীতার ৬৪৫টি শ্লোক অনুষ্টুপ এবং ৫৫টি ত্রিষ্টুপ ছন্দে রচিত।
- গীতায় অর্জুনের ৩৩টি এবং শ্রীকৃষ্ণের ৩৩টি নামের উল্লেখ রয়েছে।

ভালো কথা

কুমারীপূজা

কয়েকদিন আগে আমি জানতে পারলাম, এবার স্বস্তিকার কালীপুজোয় কুমারী রূপে আমাকে ভাবা হয়েছে। মায়ের কাছে কুমারীপুজো কী ও কেন তা শোনার পর আমার খুব আনন্দ হতে লাগল। আবার মনে ভয়ও হতে লাগল যে আমি কি পারব? পুজোর দিন সন্ধ্যায় বাবা-মায়ের সঙ্গে স্বস্তিকায় পৌঁছে প্রথমে মা কালীকে প্রণাম করে মনে মনে প্রার্থনা করলাম। তারপর সবার সঙ্গে পরিচয় হলো। কিছুক্ষণ পরে কয়েকজন কাকিমা আমাকে শাড়ি গয়না পরিয়ে, ফুল মালা দিয়ে সাজিয়ে দিলেন। তারপর আমাকে পূজামণ্ডপে নিয়ে গিয়ে মা কালীর পাশে বসিয়ে ঠাকুরমশাই মন্ত্র পড়ে পূজা করলেন। পুজো শেষে সবাই আমার পায়ে মাথা ঠেকিয়ে প্রণাম করছিল।

তারপর কুমারী সাজ খুলে আমরা প্রসাদ নিলাম। এখানে কয়েকজনের সঙ্গে আমার বন্ধুত্ব হলো। কুমারীপুজোয় আমি খুব সুন্দর অভিজ্ঞতা নিয়ে বাড়ি ফিরলাম।

অগ্নিদীপ্তা চক্রবর্তী, বাগুইহাটি, কলকাতা।

তোমার দেখা বা তোমার সঙ্গে ঘটা এরকম ভালো কোনো ঘটনা যদি থেকে থাকে তাহলে চটপট লিখে পাঠাও আমাদের ঠিকানায়।

কবিতা

কবিতা

দেবারুণ পাল, দ্বাদশশ্রেণী, ফরাক্কা ব্যারেজ কলোনি, মুর্শিদাবাদ।

আমি তোমাকে ভালোবাসি
তবু মনে আনতে পারি না
মনে মনে গেয়ে ওঠি
কলমে যে আনতে পারি না।
মাঠ ঘাট বন আকাশ দেখে
রাখি স্মৃতিপটে তোমাকে
নিরালায় বসে কাগজে কলমে
রূপ দিতে পারি না তোমাকে।
তোমাকেই খুঁজে খুঁজে ফিরি
মনে আসে কত কথা
অনেক চেষ্টা করেও
তোমায় ধরতে পারি না কবিতা।

উত্তর পাঠাতে হবে এই ঠিকানায়

নবাঙ্কুর বিভাগ
স্বস্তিকা
২৭/১বি, বিধান সরণি
কলকাতা - ৭০০ ০০৬
হোয়াটস্ অ্যাপ - 8420240584

E-mail : swastika5915@gmail.com
ফোন, এস এম এস বা মেল করা যেতে পারে।
(পঞ্চম থেকে দ্বাদশ শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীরাই উত্তর পাঠাতে পারবে)

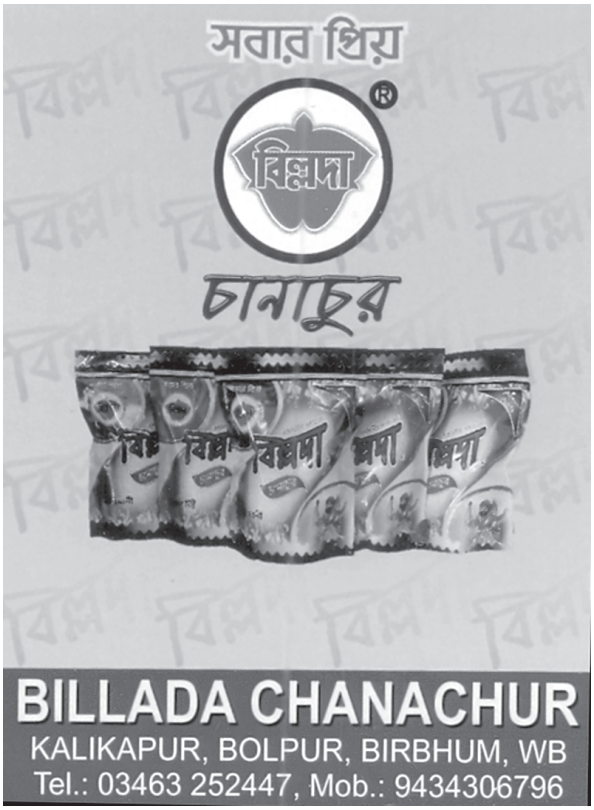

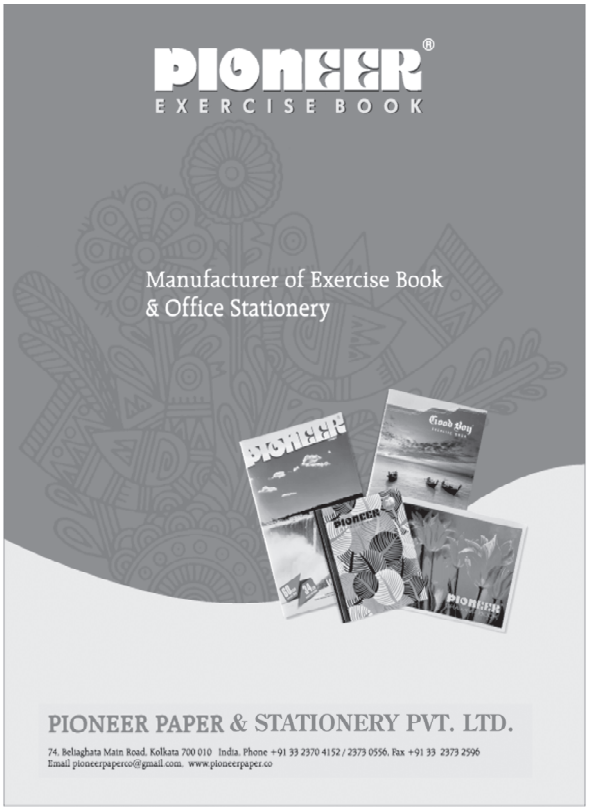

যোগ চিকিৎসা

যে কোনো শারীরিক-মানসিক রোগ, মেধা স্মৃতি-বুদ্ধি বৃদ্ধি, পড়াশুনায় উন্নতি— বিশিষ্ট যোগ চিকিৎসক-গবেষক অধ্যাপক দীপেন সেনগুপ্তের তত্ত্বাবধানে সম্পূর্ণ ভারতীয় পদ্ধতিতে মাত্র ৪০০০ টাকায় ভর্তির দিন থেকে ১ বৎসর যোগ চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়েছে। চার বৎসর বয়স থেকে সদস্য/সদস্যা নেওয়া হচ্ছে।

স্বামী সন্তদাস ইনস্টিটিউট অব কালচার যৌগিক কলেজ

১০১, সাদার্ন অ্যাভিনিউ, কলকাতা-২৯
ফোন : ৯৮৩০৫৯৭৮৮৪
৯০৫১৭২১৪২০

বেঙ্গল সামুই ফ্যাক্টরী

নিউ কমল ব্রাণ্ডের
ভাজা সামুই ব্যবহার করুন।
মাত্র দুই মিনিটে ক্ষীর তৈরী হয়।

শান্তিনিকেতন, বোলপুর,
মোবাইল - ৯২৩২৪০৯০৮৫

সংস্কৃতি ও অর্থনীতির সমন্বয়ে তৈরি হয় সমবায় ব্যবস্থা

উৎপল জালান

প্রত্যেক দেশের অর্থনৈতিক ব্যবস্থার মূলে থাকে সেই দেশের সংস্কৃতি ও জীবনশৈলী। প্রাচীন কালে ইউরোপে সাধারণ মানুষের অর্জিত সম্পদের ওপর রাজার প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণ থাকত। যদিও ভারতবর্ষে ছবিটা ছিল উলটো। এ দেশের রাজারা মানুষের 'সেবক' হিসেবে শাসনকার্য পরিচালনা করতেন। ভারত ছাড়া অন্য কোনও দেশে ধর্মের কোনও ধারণা ছিল না। ধর্ম বলতে অন্যান্য দেশে সচেতনতা— বড়োজোর মানবতা নির্ভর আত্মমর্যাদার ধরনকে কর্তব্যপালনের মানদণ্ড হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হত। ধর্ম হলো সেই মূল্যবোধ যা আমাদের অবচেতন মনে থেকে যাবতীয় সচেতন কাজকর্মের মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখে এবং নিয়ন্ত্রণ করে। ভারতের সনাতন ধর্ম বারোশো বছরের ইসলামিক ও খ্রিস্টান আগ্রাসন উপেক্ষা করে নিজের অস্তিত্ব টিকিয়ে রেখেছে। কিন্তু সাম্প্রতিক কয়েকটি দশকে বিদেশি সংস্কৃতির প্রভাবে সনাতন ধর্ম তার স্বাভাবিক উত্তরাধিকার হারাতে বসেছে এবং এই কারণে হারিয়ে যাচ্ছে এই সংস্কৃতির ওপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠা অর্থনৈতিক ব্যবস্থা। আধুনিক কালে আমরা মোটামুটি দুটি অর্থনৈতিক তত্ত্ব দেখতে পাই— ক্যাপিটালিজম (পুঁজিবাদ) ও কমিউনিজম (সাম্যবাদ)। পুঁজিবাদ নিঃসন্দেহে মুষ্টিমেয় কয়েকজনকে বিপুল সম্পদের অধিপতি বা অধিকারী হিসেবে গণ্য করে এবং সমাজের অন্যান্য মানুষজনের মনে সম্পদের প্রতি তীব্র আকাঙ্ক্ষা বুনে দেয়। দ্বিতীয় তত্ত্বটি হলো সাম্যবাদ। এই তত্ত্ব অনুযায়ী একমাত্র পলিটব্যুরোরই চিন্তাভাবনা করার মতো মন ও মস্তিষ্ক আছে। যারা পলিটব্যুরোর সদস্য নন, তারা জন্মান শুধুমাত্র শ্রমিক হবার জন্য। এই তত্ত্বে মহিলাদের দেশের সম্পত্তি বলা হয়েছে। এসব জানার পর অনেকেই হয়তো এদের সভ্য বলে মানতে চাইবেন না। সে না চান, এটা ঠিক সাম্যবাদ এক সময় সারা বিশ্বে আলোড়ন ফেলে দিয়েছিল। যদিও এখন এই তত্ত্ব প্রায় অবলুপ্তির পথে।

একটা কথা অস্বীকার করার উপায় নেই, 'Manoeuvring the Apostles' যে অর্থব্যবস্থা গড়ে তোলা হয় তার প্রধান উদ্দেশ্য হলো এমন কিছু নাগরিককে বেছে নেওয়া যারা টাকা খরচ করতে বা ধার দিতে পারেন। আবার সেইসঙ্গে এই অর্থব্যবস্থা নাগরিকদের মধ্য থেকে এমন কিছু ব্যক্তিকেও তৈরি করে নেয় যারা বিনিয়োগ করতে ইচ্ছুক। এর ফলে বিপুল সম্পদের মুষ্টিমেয় কিছু অছি বা অধিকারী তৈরি হয় এবং সরকার এদের কাছ থেকে রাজস্ব আদায় করে গরিব ও পিছিয়ে পড়া নাগরিকদের সেবা প্রদান করে। সাম্যবাদী অর্থব্যবস্থা চায় মানুষ গরিব হয়েই থাকুক যাতে রাষ্ট্রের জনকল্যাণমুখী চরিত্র বজায় থাকে। যদিও এই ব্যবস্থায় এক শ্রেণীর মানুষ যে সরকারি আনুকূল্যে বিপুল সম্পদের অধিকারী হয়ে ওঠেন তার ভুরি ভুরি প্রমাণ আছে।

আজকাল কয়েকটি দায়িত্বজ্ঞানহীন দেশ ও সম্প্রদায়ের মধ্যে মাত্রাতিরিক্ত জনসংখ্যা বৃদ্ধির প্রবণতা লক্ষ্য করা যাচ্ছে। এই ঘটনা তখন ঘটছে যখন বিশ্বের প্রায় প্রতিটি উন্নত ও দায়িত্বজ্ঞান সম্পন্ন দেশ বাড়তি জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণে নিরন্তর চেষ্টা করে চলেছে এবং সফলও হচ্ছে। সভ্য জনোচিত সন্তান উৎপাদন ও জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে সামাজিক সমর্থনের প্রশ্নটি উপেক্ষা করার মতো নয়। আমরা দেখতে পাচ্ছি বেশিরভাগ উন্নত ও জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণে দায়বদ্ধ দেশ ও সম্প্রদায়ের মানুষ কীভাবে তাদের পরিবারের

ফঃ ৬

আকার ছোট রাখার জন্য চেষ্টা করছেন। এইসব দেশের যুবক-যুবতীরা সন্তানের জন্ম দেবার আগে ভাবছেন, সময় নিচ্ছেন আবার কেউ কেউ বিয়ে না করার সিদ্ধান্তও নিচ্ছেন। এই মানসিকতা অবশ্যই প্রশংসনীয়। অবশ্য উন্নত দেশগুলিতে সন্তান সংখ্যা কম রাখার আর একটি কারণ মুদ্রাস্ফীতি, যা সভ্যতার স্বাভাবিক বিকাশের পথে একটি প্রধান অন্তরায়। কিন্তু পুঁজিবাদী অর্থব্যবস্থায় মুদ্রাস্ফীতিকে স্বাভাবিক বলে ধরে নেওয়া হয়। সুতরাং, পুঁজিবাদী অর্থব্যবস্থায় ব্যক্তির জীবনধারণের খরচ উত্তরোত্তর বেড়ে চলে।

এ সবের পাশাপাশি রয়েছে আর একটি অর্থব্যবস্থা যা গড়ে ওঠে বিভিন্ন মানুষের পারস্পরিক বোঝাপড়ার ওপর ভিত্তি করে। একে বলা হয় সমবায় অর্থব্যবস্থা। একদল মানুষ যাদের অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অভ্যাস একইরকমের তারা এই অর্থব্যবস্থায় একত্রিত হয়ে যৌথ মালিকানার ভিত্তিতে বাণিজ্যিক উদ্যোগ গড়ে তোলেন। প্রতিটি সমবায় ব্যবস্থার সদস্যদের একটি করে ভোট থাকে। কে কত শতাংশের অংশীদার তার ওপর ভোটের সংখ্যা নির্ভর করে না। সমবায় অর্থব্যবস্থার সাফল্যের কাহিনি বলে শেষ করা যাবে না। বস্তুত, মুনাফা নির্ভর বহুজাতিক কোম্পানিগুলি সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রে যেমন—অর্থনৈতিক, সামাজিক মানোন্নয়ন, সাংস্কৃতিক উন্নয়ন বা ঐতিহ্যের সংরক্ষণ ইত্যাদিতে কাজ করতে পারে কিন্তু সমবায় অর্থব্যবস্থায় আমরা মূল্যবোধ ও অর্থনীতির যে সমন্বয় দেখি তা মুনাফা নির্ভর অর্থব্যবস্থায় দুর্লভ।

আমরা, ভারতীয়রা সমবায় অর্থব্যবস্থায় ভারতবর্ষের প্রাচীন জ্ঞান ও পরম্পরার প্রতিফলন দেখতে পাই। মনে হয় যেন এই ব্যবস্থা আমাদের প্রাচীন ইতিহাসের বিবর্তিত রূপ এবং আমরা এর সঙ্গে বহুদিন ধরে পরিচিত। কিন্তু যেহেতু দীর্ঘকাল এই ব্যবস্থার অস্তিত্ব এদেশে ছিল না তাই একে খোলা মনে গ্রহণ করতে পারি না। আমাদের হাজার হাজার বছরের প্রাচীন ঋক্‌বেদ ও উপনিষদে আমাদের পূর্বপুরুষদের ধ্যানধারণা ও কর্মপদ্ধতির পরিচয় পাওয়া যায়। এবং এই কর্মপদ্ধতি পারস্পরিক সহযোগিতা, সাংস্কৃতিক বিশ্বাস, পারস্পরিক নির্ভরশীলতা ও নানা আর্থ-সামাজিক ক্রিয়া নির্ভর এক মানবতাবাদী জীবনযাপনের কথা বলে। সংস্কৃতে একটি শ্লোকে বলা হয়েছে—''অয়ং নিজঃ পরো বেত্তি গণনা লঘুচেতষাম্। উদয়চরিতানাং তু বসুধৈব কুটুম্বকম্।।'

এর অর্থ—'এটা আমার ওটা তোমার—এভাবে ভাবা দুর্বল মনের পরিচয়। যারা উদার তারা সমস্ত বিশ্বকে নিজের পরিবার বলে মনে করেন।'

রবীন্দ্রনাথের আদর্শ ও উন্নয়নমুখী জীবনযাপন সংক্রান্ত ভাবনার মূল ছিল প্রাচীন ভারতীয় দর্শন, বিশেষ করে ঔপনিবেশিক দর্শন। সমবায় নীতি প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন, ''...অর্থশক্তি সম্বন্ধেও এই কথাটাই খাটে। আজকালকার দিনে অর্থশক্তি বিশেষ ধনী সম্প্রদায়ের মুঠোর মধ্যে আটকা পড়েছে। তাতে অল্প লোকের প্রতাপ ও অনেক লোকের দুঃখঃ। অথচ বহু লোকের কর্মশক্তিকে নিজের হাতে সংগ্রহ করে নিতে পেরেছে বলেই ধনবানের প্রভাব। তার মূলধনের মানেই হচ্ছে বহুলোকের কর্মশ্রম তার টাকার মধ্যে রূপক মূর্তি নিয়ে আছে। সেই কর্মশ্রমই হচ্ছে সত্যকার মূলধন, এই কর্মশ্রমই প্রত্যক্ষভাবে আছে শ্রমিকদের প্রত্যেকের মধ্যে। তারা যদি ঠিকমতো করে বলতে পারে যে 'আমরা আমাদের ব্যক্তিগত শক্তিকে একজায়গায় মেলাব' তা হলে সেই হয়ে গেল মূলধন। স্বভাবের দোষে বা দুর্বলতায় কোনো বিষয়েই যাদের মেলবার ও মেলাবার সাধ্য নেই তাদের দুঃখ পেতেই হবে। অন্যকে গাল পেড়ে বা ডাকাতি করে তাদের স্থায়ী সুবিধা হবে না।''

রবীন্দ্রনাথ মনে করতেন ন্যায়সংগত জীবনযাপন নির্ভর করে মানুষের সঙ্গে প্রকৃতির এবং মানুষের সঙ্গে মানুষের মিথোজীবিতার ওপর। কিন্তু আধুনিক যুগে সীমাহীন প্রতিযোগিতা, ভোগবাদ ও অন্যমনস্কতার কারণে 'রিপু'র প্রকাশই শুধু চোখে পড়ে। এই প্রবণতা বন্ধ না করা গেলে এবং ন্যায়সংগত জীবনযাপনের ভিত্তি আরও মজবুত করা না হলে পরিস্থিতি আরও খারাপ হবে।

বিখ্যাত চিন্তাবিদ, দার্শনিক ও সমাজ সংস্কারক পণ্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায় এ ব্যাপারে বিশেষ জোর দিয়ে বলেছেন যে ভারতের এমন একটি স্বদেশি অর্থনৈতিক উন্নয়ন কর্মসূচি গ্রহণ করা উচিত যার মূলে থাকবে মানবিক মূল্যবোধ। তিনি বলেছেন, ভারতের প্রাচীন বেদ-উপনিষদে পুরুষার্থ-চতুষ্টয় অর্থাৎ ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষের ধারণা পাওয়া যায়। মানুষকে মূল্যবোধ ও আত্মসম্মান বজায় রেখে কর্তব্য পালনের শিক্ষা দেয় এই তত্ত্ব। জীবিকা নির্বাহের জন্য অর্থ প্রয়োজন, আবার সমাজ ও রাষ্ট্রের প্রতি দায়বদ্ধতা পালনের জন্যেও অর্থের প্রয়োজন। কিন্তু অর্থের উপার্জন করতে হবে ধর্মের দিশা নির্দেশ মেনে। কর্তব্যের মধ্যে আনন্দের সন্ধান করাই হলো কাম বা কামনা। আর মোক্ষ হলো জীবনের সর্বোত্তম লক্ষ্য।

পণ্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায়ের মতে পুঁজিবাদ ও সাম্যবাদ শুধুমাত্র বস্তুতান্ত্রিক ভোগবিলাসকে প্রাধান্য দেয়। মানবিক মূল্যবোধ এই দুই তত্ত্বে গুরুত্ব পায় না। এমনকী, উপভোক্তা, সমাজ, পরিবেশ, প্রাকৃতিক সম্পদ, ব্যক্তিসত্তা ও মানবিকতাও এই দুই তত্ত্বে উপেক্ষিত। পণ্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায় স্বদেশি জাগরণ এবং দেশজ উৎপাদন ব্যবস্থার ওপর বিশেষ জোর দিয়েছেন। এ প্রসঙ্গে আরও একজনের নাম উল্লেখ করা দরকার। তিনি লক্ষ্মণরাও ইনামদার। লক্ষ্মণরাও সহযোগিতামূলক অর্থনৈতিক উন্নয়নের মডেলে বিশ্বাস করতেন। এই মডেলের ওপর ভিত্তি করেই তিনি গঠন করেন সহকার ভারতীর মতো সংগঠন। এই সংগঠনের লক্ষ্য সমবায় প্রথার মাধ্যমে ব্যবসায়িক উদ্যোগকে প্রতিষ্ঠা করা। সমাজের বিভিন্ন স্তরে অর্থনৈতিক অসাম্য তাকে বিচলিত করেছিল। যার পরিপ্রেক্ষিতে তিনি সমবায় প্রথার মাধ্যমে সমাজে অর্থনৈতিক সাম্য ফিরিয়ে আনার কাজে ব্রতী হয়েছিলেন। লক্ষ্মণরাও মনে করতেন প্রকৃত সমবায় ব্যবস্থা গড়ে উঠবে দায়বদ্ধ স্বেচ্ছাসেবক এবং আত্মনির্ভর সংস্থাকে কেন্দ্র করে এবং বাইরের কোনও প্রভাব—এমনকী রাজনৈতিক প্রভাবও সমবায় ব্যবস্থাকে প্রভাবিত করতে পারবে না। □

পশ্চিমবঙ্গের সঙ্ঘকাজের অন্যতম স্তম্ভ কেশবরাও দীক্ষিত

সত্যনারায়ণ মজুমদার

১৯৩৯ সালে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের কারণে উদ্ভূত বৈশ্বিক পরিবেশ উপলব্ধি করে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের প্রতিষ্ঠাতা প্রাতঃস্মরণীয় ডাক্তার কেশবরাও বলিরামরাও হেডগেওয়ার বুঝতে পেরেছিলেন যে ইংরেজ শক্তির দ্বারা ভারতের ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্য বেশিদিন সঞ্চালন করা সম্ভব নয়। ফলে ভারতের স্বাধীনতা আসন্ন কিন্তু সেই স্বাধীনতা ও দেশের অখণ্ডতা রক্ষার জন্য অতি দ্রুত হিন্দু সমাজের অভ্যন্তরীণ সংগঠিত শক্তি নির্মাণ করা আবশ্যক এবং সেই কারণেই সঙ্ঘকাজের ব্যাপক বিস্তারের জন্য তিনি একটি বিশেষ অনুপাতে স্বয়ংসেবক নির্মাণ করার জন্য সঙ্ঘের কার্যকর্তাদের উদ্দেশে আবেদন রেখেছিলেন। এই বিশেষ প্রতিশতে আনুপাতিক স্বয়ংসেবক নির্মাণের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করে ১৯৪১ সালে নাগপুরে দ্বিতীয় সরসঙ্ঘচালক মাধব রাও সদাশিব রাও গোলওয়ালকর সঙ্ঘকাজের ব্যাপক বিস্তৃতির মাধ্যমে দুর্গারূপিণী দেশমাতৃকার করুণ অবস্থা বিদূরিত করে পুনরায় তাঁকে সগৌরবে প্রতিষ্ঠিত করার প্রত্যাশায় কার্যকর্তাদের প্রচারক হিসাবে সর্বক্ষণের জন্য সঙ্ঘকাজে আত্মনিয়োগ করতে আহ্বান করেছিলেন। এই আহ্বান শুনে ওই বর্গে তৃতীয় বর্ষের সঙ্ঘ শিক্ষা গ্রহণ করতে আসা মহারাষ্ট্রের ওয়ার্ধা জেলা নিবাসী এক ১৬ বছরের ছাত্রের হৃদয়ে উত্তাপ সৃষ্টি হলেও ছাত্রজীবন অসমাপ্ত থাকার জন্য সেই সময়েই সেই আহ্বানে সাড়া দিতে অক্ষম হলেও সেই তরুণ সংকল্প গ্রহণ করে যে ছাত্রজীবন সমাপ্ত করে সঙ্ঘকাজে সে সমস্ত জীবন সমর্পণ করার।

এই যুবকটির নাম কেশব রাও দত্তাত্রেয় রাও দীক্ষিত। ১৯২৫ সালের আগস্ট মাসে ওয়ার্ধা জেলার অন্তর্গত পুলগাঁওয়ে কেশব রাও জন্মগ্রহণ করেন এক নিষ্ঠাবান পুরোহিত পরিবারে। তাঁর পিতার নাম দত্তাত্রেয় রাও দীক্ষিত ও মাতা সুগুণা বাঈ। দত্তাত্রেয় রাও দীক্ষিত পৌরহিত্যের কাজের সঙ্গে সঙ্গে জীবন জীবিকা নির্বাহের জন্য একটি কাপড়ের কলে কর্মরত ছিলেন। পাঁচ ভাই ও চার বোনের মধ্যে কেশব রাও ছিলেন পরিবারের দ্বিতীয় সন্তান।

পরাধীন ভারতবর্ষে মহারাষ্ট্রের রাজনীতি, সমাজনীতি ও ধর্মনীতিতে বালগঙ্গাধর তিলকের প্রখর প্রভাব বিদ্যমান ছিল। পথ প্রদর্শক রূপে মারাঠা জনসমাজ তিলকজীকে আদর্শ নেতা হিসাবে গ্রহণ করেছিল। ফলে জাতীয় জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে যে আদর্শবাদ তিলকজী প্রচার করেছিলেন সেই আদর্শবাদই মহারাষ্ট্রের জনতা গ্রহণ করেছিল। হিন্দুত্বনিষ্ঠ, তেজস্বী দেশভক্ত হিসাবে তিলকজী হিন্দু ধর্মীয় চেতনার পুনরুত্থানের জন্যই রাজনীতিকে প্রাথমিকতা দান করেন। কারণ পরাধীনতা হিন্দুত্ব ভাবনার জাগৃতির পথে এক কঠিন বাধা স্বরূপ ছিল। এহেন রাজনীতির কেন্দ্র হিসাবে নাগপুরের সঙ্গে সঙ্গেই ওয়ার্ধা জেলা অন্যতম হিসাবে পরিচিত ছিল। ওয়ার্ধাতে গান্ধীজীর দ্বারা সর্বোদয় আশ্রম প্রতিষ্ঠিত হওয়ার জন্য রাজনৈতিক নেতাদের সমাগম প্রায়শই সেখানেই হতো, যার প্রভাব সেখানকার সাধারণ জনতার মধ্যে অতি গভীরে প্রবেশ করেছিল। ওয়ার্ধা নিবাসী আপ্পাজী যোশী ছিলেন কংগ্রেসের একজন সুপরিচিত কার্যকর্তা যাঁর সঙ্গে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের প্রতিষ্ঠাতা ডাঃ কেশবরাও বলিরাম রাও হেডগেওয়ারের সম্পর্ক ছিল অত্যন্ত আন্তরিকতাপূর্ণ। কেননা বিপ্লবী আন্দোলন থেকে শুরু করে কংগ্রেসি আন্দোলন পর্যন্ত রাজনৈতিক কার্যকলাপের সহকর্মী ছিলেন এই দুজন ব্যক্তি। ১৯২৫ সালে বিজয়া দশমীর দিন সঙ্ঘ প্রতিষ্ঠার পর অতি অল্প সময়ের মধ্যেই নাগপুর ও ওয়ার্ধা এই দুই শহর সঙ্ঘ কাজের কেন্দ্র হিসাবে পরিচিতি লাভ করে। আপ্পাজী যোশীর রাজনৈতিক ও ব্যক্তিগত প্রভাবের কারণে ওয়ার্ধা জেলাতে দ্রুত সঙ্ঘ কাজের বিস্তার ঘটে।

মহারাষ্ট্রের সামাজিক পরিবেশ ছিল হিন্দুত্ব প্রভাবিত। ফলে দত্তাত্রেয় পরিবারও এই প্রভাব থেকে মুক্ত ছিল না। আপ্পাজী যোশীর সঙ্গে দত্তাত্রেয় রাওয়ের সম্পর্ক ছিল আত্মীয়তা পূর্ণ।

পুলগাঁওয়ে দত্তাত্রেয় রাওয়ের মাধ্যমে সঙ্ঘ শাখা শুরু করার জন্য আপ্পাজী যোশী সঙ্ঘ প্রতিষ্ঠাতা ডাক্তারজীকে সেখনে নিয়ে যান।

ডাক্তারজী ১৯৩০-৩১ সালে দত্তাত্রেয় রাওকে পুলগাঁও শাখার সঙ্ঘচালক হিসাবে নিযুক্তি দান করে সেখানে শাখার কাজ শুরু করেন। ফলে ডাক্তারজী প্রতিবছর একবার পুলগাঁওয়ে শাখা পরিদর্শনে আসতেন এবং দত্তাত্রেয় পরিবারে থাকার জন্য সে সময় বালক কেশব রাও ডাক্তারজীকে চাক্ষুষ করলেও তাঁর সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা লাভের সুযোগ ছিল না। ১৯৩৯ সালে কেশব রাও যখন প্রথম বর্ষ অধিকারী শিক্ষণ বর্গের প্রশিক্ষণ গ্রহণ করছিলেন তখন তাঁর সুমধুর কণ্ঠের গান ও প্রার্থনা শুনে ডাক্তারজী অভিভূত হন এবং তখন থেকেই সঙ্ঘ প্রতিষ্ঠাতা ডাঃ হেডগেওয়ারের সঙ্গে তরুণ কেশব রাওয়ের সম্পর্কের ঘনিষ্ঠতা সৃষ্টি হতে থাকে, যার প্রভাবে এই তরুণের হৃদয়ে দেশকে স্বাধীন করার জন্য তীব্র দেশপ্রেমের আগুন প্রজ্বলিত হয়। ১৯৪০ সালে দ্বিতীয় বর্ষের অধিকারী শিক্ষণ বর্গে শিক্ষা গ্রহণ করে পরবর্তী ১৯৪১ সালেই কেশবরাও দীক্ষিত তৃতীয় বর্ষের অধিকারী শিক্ষণ বর্গে শিক্ষা গ্রহণের জন্য নাগপুরে আসেন এবং এই বর্গে দ্বিতীয় সরসঙ্ঘচালক গুরুজী প্রদত্ত দীক্ষান্ত ভাষণে উদ্বুদ্ধ হয়ে তিনি প্রচারক হিসাবে সঙ্ঘ কাজে নিজেকে উৎসর্গ করার জন্য সংকল্প গ্রহণ করেন।

১৯৪২ সাল থেকেই প্রান্তের প্রতিটি অধিকারী শিক্ষণ বর্গে কেশবরাও শিক্ষক বা প্রবন্ধক হিসাবে যেমন কর্মরত থাকতেন তেমনি ১৯৪৫ সালে মারাঠি ও সংস্কৃতে সাম্মানিক-সহ স্নাতক উপাধি লাভ করে সঙ্ঘ কাজের বিস্তারের জন্য সঙ্ঘের অধিকারীদের পরিকল্পনা অনুযায়ী প্রান্তের বহুস্থানে বিস্তারক হিসাবে কর্মরত ছিলেন। ১৯৪৭ সালে জলগাঁও জেলার অন্তর্গত শেন্দুর্নীতে তিনি বিস্তারক হিসাবে নিযুক্ত ছিলেন। এই সময় দেশ খণ্ডিত হয়ে স্বাধীনতা লাভ করলেও পাকিস্তান সৃষ্টির ফলে হিন্দু নিধন, হিন্দুর উপর নির্যাতন, উদ্বাস্তু সমস্যা প্রভৃতি কারণে সমগ্র দেশের সামাজিক পরিস্থিতি ছিল অত্যন্ত অস্থির। এই অস্থির পরিস্থিতির মধ্যেই ১৯৪৮ সালে গান্ধীজীর দুর্ভাগ্যজনক নিধনের মিথ্যা অজুহাতে সঙ্ঘ বিরোধী কেন্দ্রীয় সরকার সঙ্ঘকে নিষিদ্ধ করে। ফলে সমগ্র দেশে সঙ্ঘের কাজ বন্ধ হয়ে যায়। সঙ্ঘের উচ্চ অধিকারীদের নির্দেশেই এই সময় কেশব রাও পুলগাঁওয়ে নিজগৃহে প্রত্যাবর্তন করেন। ১৯৪৯ সালের ৯ ডিসেম্বর সঙ্ঘের উপর থেকে অনৈতিক প্রতিবন্ধকতা প্রত্যাহার করার জন্য স্বয়ংসেবকরা সত্যাগ্রহ আন্দোলন শুরু করলে ওয়ার্ধা জেলার সত্যাগ্রহীদের সঙ্গে কেশব রাও সত্যাগ্রহ আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেন। ভারতবর্ষের প্রায় সমস্ত প্রদেশেই সত্যাগ্রহীরা পুলিশ প্রশাসনের দ্বারা বিভিন্নভাবে অত্যাচারিত হলেও মহারাষ্ট্রের পুলিশের আচরণ শিষ্ঠতাপূর্ণ ও নরম ছিল। কারণ তারা সত্যাগ্রহীদের সাহস ও শৃঙ্খলাতে প্রভাবিত হয়েছিল। ওয়ার্ধা জেলাতে শতাধিক সত্যাগ্রহীকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল যাদের জরিমানা যেমন দিতে হয়েছিল তেমনি ছয় মাসের জন্য কারাবাসের সাজাও বরণ করতে হয়েছিল। এককভাবে সঙ্ঘ শক্তির দ্বারা সঞ্চালিত ব্যাপক সত্যাগ্রহ আন্দোলনের কারণে ১৯৪৯ সালের মাঝামাঝি সরকার নিঃশর্তভাবে সঙ্ঘকে নির্দোষ ঘোষণা করে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করতে বাধ্য হলে সঙ্ঘকাজ পুনরায় শুরু হয় এবং এই কাজের পুনরারম্ভ ও ব্যাপক বৃদ্ধির জন্য শ্রীগুরুজী সমগ্র দেশ থেকে অধিক পরিমাণে প্রচারক হিসাবে কার্যকর্তারা যাতে এগিয়ে আসে তার জন্য উদাত্ত আহ্বান প্রদান করেন।

১৯৪৯ সালের মধ্যবর্তী কালখণ্ড থেকে যেমন পুনরায় শাখার কাজ শুরু হয় তেমনি ১৯৫০ সাল থেকে পুনরায় অধিকারী শিক্ষণ বর্গও শুরু হয়। ১৯৫০ সালে পুণেতে অনুষ্ঠিত অধিকারী শিক্ষণ বর্গে একনাথ রাণাডে সমাপ্তি উৎসবে উপস্থিত ছিলেন। ১৯৪৯ সালেই একনাথ রানাডে ক্ষেত্র প্রচারক হিসাবে বাঙ্গলা, অসম ও উৎকল প্রদেশের সঙ্ঘকাজের তত্ত্বাবধানের জন্য নিযুক্তি লাভ করে কলকাতাকে কেন্দ্র করেন। পুনেতে অনুষ্ঠিত অধিকারী শিক্ষণ বর্গে পূর্বাঞ্চল ক্ষেত্রের বিভিন্ন সমস্যা বিষয়ে শিক্ষার্থীদের উদ্দেশে একনাথজী একটি অধিবেশনে বক্তব্য রেখেছিলেন। এই শিক্ষণ বর্গে কেশবরাও দীক্ষিত শিক্ষক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। একনাথজীর আবেদন ক্রমে মহারাষ্ট্র প্রদেশ থেকে যে ১০ জন প্রচারক কলকাতাতে সঙ্ঘকাজের জন্য নিযুক্তি লাভ করেছিলেন তার মধ্যে অন্যতম ছিলেন কেশব রাও দীক্ষিত। তিনি কলকাতায় আসার পর পূর্বাঞ্চল ক্ষেত্রে কর্মরত প্রচারকদের একটি বৈঠকের আয়োজন করা হয়। এই বৈঠকে অসম, বাঙ্গলা ও উৎকল প্রদেশে কর্মরত প্রায় ৭০ জন প্রচারক উপস্থিত ছিলেন যেখানে কেশবজীকে কলকাতা মহানগরের বড়বাজারের সায়ম্ বিভাগের প্রচারক হিসাবে নিযুক্তির ঘোষণা করা হয় এবং প্রভাত বিভাগের প্রচারক হিসাবে দায়িত্ব লাভ করেন নারায়ণ তারটে। তখন কলকাতা নগরের প্রচারক ছিলেন কালিদাস বসু। কয়েক মাসের মধ্যেই নারায়ণ রাও তারটে নাগপুরে ফিরে গেলে কেশবজীকে বড়বাজারের প্রচারক হিসাবে (সায়ম্ ও প্রভাত বিভাগের) নিযুক্তি দেওয়া হয়।

১৯৪৮-৪৯ সালে সঙ্ঘ নিষিদ্ধ থাকার জন্য কলকাতা-সহ সমগ্র রাজ্য সঙ্ঘের কাজ অত্যন্ত দুর্বল হয়ে পড়ে। দেশভাগের জন্য উদ্বাস্তু সমস্যা, সঙ্ঘ বিরোধী প্রচার, কার্যকর্তাদের মনে অনেক সংশয় থাকার ফলে তাদের নিষ্ক্রিয়তা প্রভৃতি কারণে ১৯৫০ সাল থেকে ১৯৬০ সাল পর্যন্ত সঙ্ঘ কাজের কোনো গতি সৃষ্টি হয়নি।

১৯৫০ সালে কেশবজী যখন কলকাতার প্রচারক হিসাবে কাজ করছিলেন তখন পশ্চিমবঙ্গে ৪৫টি শাখা চলছিল। ১৯৫৬ সাল পর্যন্ত সঙ্ঘ কাজের পরিস্থিতির কোনো পরিবর্তন হয়নি। ১৯৬০ সালের পর কাজে কিছুটা গতি সৃষ্টি হয় যার কারণ ছিল যে প্রতিষ্ঠিত নাগরিকদের সঙ্ঘ কাজের প্রতি আকৃষ্ট করার জন্য প্রকাশ্য বার্ষিক অনুষ্ঠান, পথ সঞ্চলন ইত্যাদি কার্যক্রমের আয়োজন। ১৯৫১ সালে শ্রীগুরুজীর উপস্থিতিতে কলকাতার শহিদ মিনার ময়দানে কলকাতা শাখার প্রথম বার্ষিক অনুষ্ঠান হয় যেখানে প্রধান অতিথি রূপে উপস্থিত ছিলেন ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি। প্রতিবছর পয়লা বৈশাখ ও বিজয়াদশমীর দিন পথ সঞ্চলনের কার্যক্রম অনুষ্ঠিত হতে থাকে। পূর্ব পাকিস্তান থেকে আগত বাস্তুহারাদের ত্রাণের জন্য ১৯৫০ সালে বাস্তুহারা সহায়তা সমিতি গঠিত হয়। এই প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে যে সেবা কাজ পরিচালিত হয় তার জন্যও বহু প্রতিষ্ঠিত নাগরিক সঙ্ঘের প্রতি আকৃষ্ট হন। যুবক প্রচারক কেশবরাও অতি অল্প সময়ে বাঙ্গলার আদব কায়দা ও বাংলাভাষাতে পারদর্শী হয়ে আদ্যোপান্ত বাঙ্গালি হয়ে ওঠেন। কলকাতার বিশিষ্ট খ্যাতানামা ব্যক্তিদের সঙ্গে সুসম্পর্ক স্থাপন করে বার্ষিক উৎসবে তাঁদের সঙ্ঘকাজ দর্শনের জন্য আমন্ত্রণ করে নিয়ে আসতেন। কিশোর মুখার্জী, অধ্যক্ষ পূর্ণচন্দ্র ঘোষ, ডঃ কালিকিঙ্কর সেনগুপ্ত, স্বামী নির্মলানন্দ, আয়রন ম্যান নীলমণি দাস, ডঃ জ্যোতিষ মৈত্র, হেরম্ব ভট্টাচার্য প্রমুখ খ্যাতনামা ব্যক্তিরা কলকাতার বার্ষিক উৎসবে এবং অন্যান্য কার্যক্রমে উপস্থিত হয়েছিলেন। পরবর্তীতে নীলমণি দাস ও হেরম্ব ভট্টাচার্য সঙ্ঘচালকের দায়িত্বও গ্রহণ করেছিলেন। এহেন প্রয়াসের ফলে সঙ্ঘের শাখা যেমন বৃদ্ধি হতে থাকে

তেমনি নাগরিকদের আকৃষ্ট করার জন্য ঘোষ বিভাগেরও উন্নতি সাধনে কেশবজীর অবদান ছিল প্রশংসনীয়। তাঁর অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলে কলকাতাতে দক্ষ বাদক দল নির্মাণ করা সম্ভব হয়েছিল। ১৯৫২ সালে প্রথম ঘোষ-সহ ২৫০ জন গণবেশধারী স্বয়ংসেবকের পথ সঞ্চলন কলকাতাতে অনুষ্ঠিত হয়। সে সময়ের ঘোষ প্রমুখ অধিবক্তা নন্দলাল সাউ কেশব রাওয়ের ভূয়সী প্রশংসা করেন এবং বলেন যে ১৯৭৫ সালে বালাসাহেবজীও কলকাতার ঘোষ বিভাগের প্রশংসা করেছিলেন। ১৯৬৫ সালে শ্রীগুরুজীর উপস্থিতিতে পশ্চিমবঙ্গের স্বয়ংসেবকদের যে সম্মেলন কলকাতার শহিদ মিনার ময়দানে আয়োজিত হয়েছিল সেই কার্যক্রমে কলকাতা শাখার সংখ্যা ছিল ২০০০ তরুণ ও ১৬০০ বালক স্বয়ংসেবক। ১৯৬২ সালে চীনের আক্রমণের প্রতিবাদে জনজাগরণের জন্য কলকাতা শহরে প্রতি ১৫ দিন অন্তর পথ সঞ্চলনের কার্যক্রম অনুষ্ঠিত হতে থাকে। এই কার্যক্রমে ৭০০ থেকে ৮০০ জন স্বয়ংসেবক অংশগ্রহণ করতো, ফলে স্বয়ংসেবক ও সাধারণ নাগরিকের মনে আত্মবিশ্বাস সৃষ্টি হয়। এহেন জনজাগরণকে অব্যাহত রাখার জন্য এবং স্বয়ংসেবকদের মনে আত্মবিশ্বাস অটুট রাখার জন্য ১৯৬৫ সালে শ্রীগুরুজীর উপস্থিতিতে শহিদ মিনার ময়দানে নাগরিক-সহ স্বয়ংসেবকদের সমাবেশের ব্যবস্থা করা হয়েছিল। যদিও এর পূর্বে স্বামী বিবেকানন্দের জন্মশত বার্ষিকী উৎসব কলকাতাতে পালন করার জন্য স্বামী ত্রিপুরানন্দ, ডঃ রমেশ চন্দ্র মজুমদার, ডঃ যতীন্দ্র বিমল চৌধুরী, অশোক সেন, রণদেব চৌধুরী প্রমুখ স্বনামধন্য প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তিদের অকুণ্ঠ সহযোগিতা সঙ্ঘ লাভ করতে সক্ষম হয়েছিল। এই কালখণ্ডে কেশব রাও ছিলেন কলকাতা মহানগর প্রচারক এবং প্রান্ত প্রচারক ছিলেন অমলকুমার বসু। ১৯৫৮ সাল থেকে প্রতি বছর পশ্চিমবঙ্গে অধিকারী শিক্ষণ বর্গও চলতে থাকে। এই বর্গে বিভিন্ন সময়ে ডঃ শ্রীকুমার ব্যানার্জী, ডঃ গোবিন্দ গোপাল মুখার্জী, দেবজ্যোতি বর্মণ, ডঃ নীহারেন্দু দত্ত মজুমদার প্রমুখ বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ও প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তিগণ উপস্থিত হয়েছিলেন। এই সমস্ত কারণে সঙ্ঘের কাজ যখন দ্রুত বৃদ্ধি হচ্ছিল ঠিক সেই সময়েই অর্থাৎ ১৯৭৫ সালে দেশে জরুরি অবস্থা ঘোষিত এবং সঙ্ঘকার্য নিষিদ্ধ হয়। তখন সমগ্র প্রদেশে শাখার সংখ্যা ছিল ২৫৫টি। সঙ্ঘ নিষিদ্ধ হওয়ার জন্য বহু কার্যকর্তা অকারণে বন্দি হলেন। আতঙ্কের পরিবেশ সৃষ্টি হলো সমগ্র প্রদেশে। সেই সময় আত্মগোপন করে সঙ্ঘকাজের পরিকাঠামো বজায় রাখার জন্য এবং কার্যকর্তাদের মনোবল অটুট রাখার জন্য যে সমস্ত অধিকারীকে গ্রেপ্তার বরণ না করে ছদ্মবেশে সমগ্র প্রদেশ ভ্রমণ করার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল তাঁদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন কেশবরাও দীক্ষিত, যিনি ট্রাক ড্রাইভারের ছদ্মবেশে প্রদেশের কার্যকর্তাদের সাথে সাক্ষাৎ করতেন এবং সঙ্ঘের উপর থেকে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহারের জন্য আন্দোলনের বিভিন্ন পরিকল্পনা সম্পর্কে তাঁদের নির্দেশ দান করতেন। ১৯৭৭ সালে সঙ্ঘের উপর থেকে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহৃত হলে সারা ভারতের সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গের সঙ্ঘকাজ পুনরায় শুরু হয়। ১৯৭৭ থেকে ৮৭ পর্যন্ত এই সময়সীমার মধ্যে পশ্চিমবঙ্গের সঙ্ঘকাজের ব্যাপক বিস্তৃতি ঘটে। ১৯৭৭ থেকে ১৯৭৯ সাল পর্যন্ত কেশব রাও দীক্ষিত সহপ্রান্ত প্রচারকের দায়িত্ব গ্রহণ করেন এবং ১৯৭৯ সালের মার্চ মাসের পরে প্রাপ্ত প্রচারক হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন।

১৯৭৭ সালের পর থেকে প্রদেশে প্রচারকের সংখ্যা বৃদ্ধি হতে থাকে, ফলে সঙ্ঘকাজেরও প্রসার হতে থাকে। কলকাতাতে এই সময়ে দ্বিতীয় সরসঙ্ঘচালক বালাসাহেবজী বলেছিলেন যে রামকৃষ্ণ মিশন এবং কমিউনিস্ট দল যদি বাঙ্গলা থেকে সমর্পিত কার্যকর্তা লাভ করতে সক্ষম হয় তবে সঙ্ঘ কেন প্রচারক পাবে না? আমরা যদি সঠিকভাবে চেষ্টা করি তবে পশ্চিমবঙ্গ থেকে সুনিশ্চিতভাবে প্রচারক পাওয়া যাবে। বিভিন্ন বৈঠকে সেই সময় কেশবজী বালাসাহেবজীর প্রত্যাশার কথা কার্যকর্তাদের উদ্দেশে বলতেন, ফলে কার্যকর্তাগণ প্রেরণা লাভ করেন এবং কয়েক বছরের মধ্যেই প্রচারক সংখ্যা বৃদ্ধি পেতে থাকে। কলকাতাস্থিত কেশব ভবনের শিলান্যাসের সময় প্রদেশে প্রচারকের সংখ্যা দাঁড়ায় ১০০ জন। এই সময় অন্যান্য প্রান্তেও প্রচারক পাঠানো শুরু হলো। ১৯৯১ সাল পর্যন্ত প্রদেশে শাখার সংখ্যা ছিল ১০০০। ১৯৯২ সালে কল্যাণীতে প্রদেশের তরুণ স্বয়ংসেবকের যে তিনদিন ব্যাপী শিবির অনুষ্ঠিত হয় সেখানে ১৮ হাজার স্বয়ংসেবক অংশগ্রহণ করেছিলেন। এই শিবিরের সাফল্যে আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে কেশবজী বলেছিলেন যে বাঙ্গলাতে সাম্যবাদী দল শাসন ক্ষমতাকে কুক্ষিগত করেছে কিন্তু আদর্শবাদের সংগ্রামে স্বয়ংসেবকরা অবশ্যই এক সময় জয় লাভ করবে। ''I shall rule unchallenged in the intellectual life of the world'' —স্বামী বিবেকানন্দের এই চিন্তাধারাই যেন কেশবজী আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে সেদিন ঘোষণা করেছিলেন।

পশ্চিমবঙ্গের সঙ্ঘকাজে বহু বাধাবিঘ্ন এসেছে কিন্তু কেশবজীর আত্মবিশ্বাসের অভাব কখনও লক্ষ্য করা যায়নি। যে কোনো অস্থির পরিবেশ সকলের সহযোগিতায় তিনি যোগ্য সমাধান করেছেন। রামমন্দিরের আন্দোলনের সময় ১৯৯২ সালে সঙ্ঘকে যখন তৃতীয়বার নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয় সে সময়েও ছদ্মবেশ ধারণ করে কেশব রাও পুলিশের চোখকে ফাঁকি দিয়ে সমস্ত প্রদেশ ভ্রমণ করে কার্যকর্তাদের মনোবলকে অটুট রেখেছিলেন। এই রাজ্যে তিনি ৭২ বছর অতিবাহিত করেছেন এবং অনেক প্রকার সাংগঠনিক দায়িত্বও পালন করেছেন। সহ ক্ষেত্র প্রচারক, পূর্ব ক্ষেত্রের বৌদ্ধিক প্রমুখ, প্রান্তের সম্পর্ক প্রমুখ প্রভৃতি দায়িত্ব তিনি অত্যন্ত যোগ্যতার সঙ্গে পালন করেছেন। বাঙ্গলাতে সঙ্ঘ আজ এক দৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হয়েছে তাঁর সুদৃঢ় সাংগঠনিক নেতৃত্বের কারণে। তাই বাঙ্গলার কাজের অন্যতম স্তম্ভ হিসাবে তাঁকে স্বয়ংসেবকরা মনে করে। অসংখ্য সুযোগ্য কার্যকর্তা তিনি তৈরি করেছেন তাঁর দীর্ঘ কর্মজীবনে। এই পুণ্যাত্মা এই বছর (২০২২ সাল) ২০ সেপ্টেম্বর সকলকে শোকার্ত করে ৯৮ বছর বয়সে বিলীন হলেন পঞ্চভূতে। সেই সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গের রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের ৭২ বছরের এক উজ্জ্বল অধ্যায়ের পরিসমাপ্তি ঘটলো, কিন্তু আগামীদিনের সঙ্ঘ কাজের বিস্তারে কেশবজী অন্যতম প্রেরণাদাতা রূপে সমস্ত স্বয়ংসেবকের হৃদয়ে চির বিরাজমান থাকবেন, কেননা তিনি তো সদা পূর্ব দিগন্তের অংশুমান—

''মৃত্যুহীন মরণের যত পূজা যুগ যুগ ধরি
যে মন্ত্রে এনেছে উচ্চারি,
সে-মন্ত্র পেয়েছে প্রাণ তোমার পথের মাঝে
যে মন্ত্র সার্থক হলো জীবনের অবিচ্ছিন্ন কাজে।''

প্রণাম জানাই সংস্কৃত ও সংস্কৃতির অখণ্ড পূজারিকে।

□

বিশ্বের বৃহত্তম চিনি উৎপাদক ও দ্বিতীয় বৃহত্তম রপ্তানিকারক দেশ ভারত

বিশেষ প্রতিনিধি॥ ২০২১-২২ চিনি মরসুমে (অক্টোবর- সেপ্টেম্বর) রেকর্ড ৫ হাজার লক্ষ মেট্রিক টনের বেশি আখ উৎপাদন হয়েছে। এর মধ্যে ৩৫৭৪ লক্ষ মেট্রিক টন আখ থেকে ৩৯৪ লক্ষ মেট্রিক টন চিনি বা সুক্রোজ উৎপাদিত হয়েছে চিনিকলে যার মধ্যে ৩৫ লক্ষ মেট্রিক টন চিনি থেকে ইথানল উৎপাদন হয়েছে। ৩৫৯ লক্ষ মেট্রিক টন চিনি উৎপাদন হয়েছে। এর ফলে ভারত বিশ্বের বৃহত্তম চিনি উৎপাদক ও গ্রাহক হওয়ার পাশাপাশি বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম চিনি রপ্তানিকারক দেশ হয়ে উঠেছে।

ভারতীয় চিনি ক্ষেত্রের জন্য এই মরসুমটি ছিল অত্যন্ত ভালো। আখ ও চিনি উৎপাদন, চিনি রপ্তানি, আখ সংগ্রহ, বকেয়া মেটানো এবং ইথানল উৎপাদন— সবক্ষেত্রেই এই মরসুমে রেকর্ড সৃষ্টি হয়েছে। সহায়ক আন্তর্জাতিক এবং ভারত সরকারের বাণিজ্য নীতির ফলেই ভারতীয় চিনি শিল্পে এই সাফল্য এসেছে। এই রপ্তানির ফলে দেশের ৪০ হাজার কোটি টাকার বিদেশি মুদ্রা আয় হয়েছে। চিনি শিল্পের এই সাফল্যের জন্য কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারগুলি, কৃষক, চিনিকল, ইথানল ডিস্টিলারি, সকল সহযোগী প্রয়াসের পাশাপাশি দেশে বাণিজ্যিক পরিবেশের সার্বিক উন্নতিও একটি কারণ। গত পাঁচ বছরে সরকারের সময়োপযোগী পদক্ষেপের কারণে কৃষিক্ষেত্রে ধাপে ধাপে উন্নতি ঘটেছে। ২০১৮-১৯ টার্মের আর্থিক সংকট থেকে ২০২১-২২এ উত্তরণ হয়েছে স্বনির্ভরতায়।

২০২১-২২ চিনি মরসুমে চিনিকলগুলি ১ লক্ষ ১৮ কোটি টাকার বেশি মূল্যের আখ সংগ্রহ বাবদ প্রদান করে ১.১২ লক্ষ কোটির বেশি টাকা। ভারত সরকারের কাছে কোনো আর্থিক সহায়তা (ভরতুকি) মেলেনি। ফলে, চিনি মরসুমের শেষে বকেয়ার পরিমাণ ছিল ৬ হাজার কোটি টাকারও নীচে। যার অর্থ আখ বাবদ দেয় অর্থের ৯৫ শতাংশ মেটানো হয়েছে।

গত পাঁচ বছরে জৈব জ্বালানি ক্ষেত্রে ইথানলের বৃদ্ধি চিনি ক্ষেত্রকে যথেষ্ট সাহায্য করেছে। কারণ, চিনিকে ইথানল হিসেবে ব্যবহার করার ফলে চিনিকলগুলির আর্থিক পরিস্থিতি আরও উন্নত হয়েছে এবং কার্যকরী মূলধনের প্রয়োজন কমেছে। ২০২১-২২ বর্ষে ইথালন বেচে চিনিকল ও ডিস্টিলারি ১৮ হাজার কোটি টাকার রাজস্ব আদায় হয়েছিল। এর ফলে কৃষকদের আখের জন্য বকেয়াও তাড়াতাড়ি মেটানো গেছে। ঝোলাগুড়, চিনিভিত্তিক ডিস্টিলারিগুলির ইথানল উৎপাদন ক্ষমতা বেড়ে বার্ষিক ৬০৫ কোটি লিটার হয়েছে। এই উৎপাদন এখন বেড়েই চলেছে যাতে ২০২২-এর মধ্যে ভারতের ২০ শতাংশ জৈব জ্বালানি মিশ্রণের লক্ষ্যমাত্রা পূরণ হয়।

চীনা অ্যাপ নিয়ে সতর্কবার্তা কেন্দ্রের

নিজস্ব প্রতিনিধি।। ঋণ সংক্রান্ত চীনা অ্যাপগুলোর বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নিতে রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলির জন্য একগুচ্ছ নির্দেশিকা জারি করেছে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক। কেন্দ্রের বক্তব্য, এইসব অ্যাপের জন্য হেনস্থার কারণে একাধিক আত্মহত্যার ঘটনা ঘটেছে। যার ফলে জাতীয় নিরাপত্তা, অর্থনীতি ও নাগরিকদের সুরক্ষার পক্ষে বড়ো বিপদ হয়ে উঠছে।

অভিযোগ, চীনা অ্যাপগুলি ঋণ দেওয়ার নামে এদেশের সাধারণ মানুষকে ফাঁদে ফেলছে। অবৈধভাবে ধার দিয়ে অনেক বেশি গুণ টাকা দাবি করছে। টাকা না পেলে বা চাহিদার তুলনায় কম টাকা পেলে ঋণগ্রহীতার আত্মীয়স্বজন ও বন্ধুদের ফোন করে দুর্ব্যবহার করছে প্রতারকেরা। এমনকী ভুয়ো অশ্লীল ছবি নেটমাধ্যমে ছড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে। হয়রানির শিকার হয়ে অনেকে আত্মহত্যা করছে বলে জানিয়েছে বিভিন্ন রাজ্যের পুলিশ।

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের তরফে জানানো হয়েছে, অ্যাপগুলি নিয়ে বিভিন্ন রাজ্যে বহু অভিযোগ জমা পড়েছে। চীনা অ্যাপের এমন নিত্যনতুন প্রতারণার বিষয়ে আমজনতাকে সতর্ক করার পাশপাশি অভিযোগ এলে রাজ্যগুলিকে গুরুত্ব সহকারে তদন্ত চালাতে এবং অপরাধীদের খুঁজে বার করার নির্দেশ দিচ্ছে কেন্দ্র।

২৯০০ কোটি টাকারও বেশি রেল প্রকল্প জাতির উদ্দেশে উৎসর্গ করলেন প্রধানমন্ত্রী

পিআইবি।। গত ৩১ অক্টোবর আমেদাবাদের আসারভায় ২৯০০ কোটি টাকারও বেশি মূল্যের দুটি রেল প্রকল্প জাতির উদ্দেশে উৎসর্গ করেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। ফলে এতদিন গুজরাটের বিস্তীর্ণ এলাকার লক্ষ লক্ষ মানুষ ব্রডগেজ লাইনের অভাবে যে সমস্যা ভোগ করতেন, তার থেকে রেহাই পাবেন গুজরাটবাসী। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, আসারভা থেকে হিম্মতনগর হয়ে উদয়পুর পর্যন্ত মিটারগেজ রেলপথটিকে পুরোপুরি ব্রডগেজে রূপান্তরিত করা হয়েছে। গুজরাটের এই প্রান্ত প্রতিবেশী রাজ্য রাজস্থান এমনকী সারা দেশের সঙ্গে এখন থেকে সরাসরি যুক্ত হবে।

এদিন দেশজুড়ে রেল স্টেশনগুলির উন্নতির ওপর আলোকপাত করেন প্রধানমন্ত্রী। তিনি বলেন, ''বর্তমানে ভারতীয় রেলের উন্নয়নের ফলে কেবলমাত্র গতি বৃদ্ধি হওয়া ও দূরত্ব কমাই নয় সেইসঙ্গে পরিষেবার মান, স্বাচ্ছন্দ্য, নিরাপত্তা ও পরিচ্ছন্নতাও বৃদ্ধি পাচ্ছে।''

ভারত সরকারের ইতিবাচক পদক্ষেপের দরুন দেশের 'লাইফলাইন' ভারতীয় রেলের উন্নয়নে দেশের অগ্রগতি সুনিশ্চিত হচ্ছে।

স্বীকৃতিবিহীন পোর্টফোলিয়ো ম্যানেজমেন্ট পরিষেবা প্রদানকারীদের বিরুদ্ধে সতর্কতা জারি সেবির

পিআইবি।। যেসব সংস্থা পোর্টফোলিয়ো ম্যানেজমেন্ট পরিষেবা দেওয়ার নাম করে মানুষের কাছ থেকে বেআইনিভাবে মানুষের কাছ থেকে টাকা সংগ্রহ করছে, তাদের বিরুদ্ধে নজরদারি শুরু করেছে সিকিউরিটি অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড অব ইন্ডিয়া (সেবি)। এই সংস্থাগুলি প্রচারপত্র ও সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্মগুলিকে ব্যবহার করে প্রচুর রিটার্ন দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়ে মানুষকে প্রলোভিত করছে। দেখা গেছে, এইসব স্কিমের মাধ্যমে নির্দিষ্ট রিটার্নের প্রতিশ্রুতি দিয়ে তুলনামূলক কম পরিমাণে টাকা তুলছে এইসব সংস্থা। কয়েকটি সংস্থা এমন নাম ব্যবহার করছে যেগুলি সেবি নথিভুক্ত সংস্থারই মতো। ফলে সাধারণ মানুষ খুব সহজেই তাদের প্রতারণার জালে জড়িয়ে যাচ্ছেন।

সেবি সেজন্য লগ্নিকারীদের এইধরনের অবৈধ অর্থ সংগ্রহকারীদের শিকার না হওয়ার জন্য সতর্ক করে দিয়েছে। সিকিউরিটি মার্কেটে লগ্নি করার সময় শুধুমাত্র নথিভুক্ত সংস্থার মাধ্যমেই তা করতে বলা হচ্ছে। পোর্টফোলিয়ো ম্যানেজার (যারা পোর্টফোলিয়ো ম্যানেজমেন্ট স্কিমগুলি পরিচালনা করে)-সহ সেবি নথিভুক্ত সংস্থাগুলি কখনোই লগ্নির ওপর নিশ্চিত বা স্থায়ী রিটার্নের প্রতিশ্রুতি দেয় না। বাজারে এরকম বহু স্বীকৃতিবিহীন স্কিম চলছে, পনজি স্কিমের মতোই যাদের প্রকৃত অর্থেই সিকিউরিটি মার্কেটে কোনও লগ্নি নেই।

সেবি (পোর্টফোলিয়ো ম্যানেজার্স) রেগুলেশনস, ২০২০ অনুযায়ী একজন পোর্টফোলিয়ো ম্যানেজারকে কর্পোরেট সংস্থা হতে হবে, সেবি নথিভুক্ত হতে হবে এবং একজন গ্রাহকের সঙ্গে তহবিল বা সিকিউরিটিজ পোর্টফোলিয়ো ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত চুক্তি থাকতে হবে। এছাড়া, একজন পোর্টফোলিয়ো ম্যানেজার একজন গ্রাহকের কাছ থেকে কোনও অবস্থাতেই ৫০ লক্ষ টাকার কমে তহবিল বা সিকিউরিটি সংগ্রহ করতে পারবেন না এবং প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে নিশ্চিত রিটার্নের প্রতিশ্রুতি দিতে পারবেন না।

এইধরনের স্বীকৃতিবিহীন স্কিমে টাকা লগ্নির আগে জনগণকে সজাগ ও সতর্ক থাকার পরামর্শ দিচ্ছে সেবি।

।। চিত্রকথা।। মহামানব মহানামব্রত।। ১৮।।

ভাটপাড়ায় পঞ্চানন তর্কবাগীশের বাড়িতে থেকে পড়াশোনা করার সময় মহানামব্রতজী খুব অসুস্থ হয়ে পড়েন। সেই অবস্থাতেই তিনি পরীক্ষা দিলেন। সেটা ১৯৩০ সাল। স্বর্ণপদক পেলেন মহানামব্রতজী তাঁর কৃতিত্বের জন্য।

এই সময় থেকেই লেখালিখির কাজ শুরু করে দিলেন তিনি। তাঁর লেখা প্রথমে বই 'ব্রহ্মচর্য্য তত্ত্বজ্যোতি' এই সময়েই লেখা হয়েছিল।

(ক্রমশ)